ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

তাসলিমা আক্তার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

কৃতজ্ঞতা

বেসরকারি চিকিৎসাসেবার সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ, ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রেজওয়ানুল আলম, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক আবদুল আহাদ, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা ও মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৫

অধ্যায় এক: ভূমিকা **৬**
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ৬
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৬
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৭
১.৪ গবেষণার আওতা ৭
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ৭
১.৬ গবেষণার সময় ৮
১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো ৮

অধ্যায় দুই: বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো **৯**
২.১ ভূমিকা ৯
২.২ বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত সম্পর্কিত আইনি কাঠামো ৯
২.৩ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৪
২.৪ বেসরকারি চিকিৎসাসেবার আইনি সীমাবদ্ধতা ১৫
২.৫ উপসংহার ১৭

অধ্যায় তিন: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা **১৮**
৩.১ ভূমিকা ১৮
৩.২ নিবন্ধন কার্যক্রম ১৮
৩.৩ লাইসেন্স নবায়ন ২০
৩.৪ অবকাঠামো ২১
৩.৫ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ২৩
৩.৬ জনবল ব্যবস্থাপনা ২৪
৩.৭ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ২৬
৩.৮ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ২৮
৩.৯ বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় বিপণন ব্যবস্থা ২৮
৩.১০ উপসংহার ৩১

অধ্যায় চতুর্থ: চিকিৎসাসেবা **৩২**
৪.১ ভূমিকা ৩২
৪.২ চিকিৎসক প্রদত্ত সেবা ৩২
৪.৩ নার্স প্রদত্ত সেবা ৩২
৪.৪ আয়া/ ওয়ার্ডবয় প্রদত্ত সেবা ৩৩
৪.৫ রোগ-নির্ণয় ৩৩
৪.৬ ওষুধ ৩৫
৪.৭ বিশেষায়িত সেবা ৩৫
৪.৮ প্রসূতি সেবা ৩৬
৪.৯ সেবার মূল্য ৩৭
৪.১০ তথ্যের উন্মুক্ততা ৩৮
৪.১১ উপসংহার ৩৯

অধ্যায় পাঁচ: বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম **৪০**
৫.১ ভূমিকা ৪০
৫.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম ৪০
৫.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি ৪১
৫.৪ চিকিৎসকদের তদারকি ৪১
৫.৫ উপসংহার ৪২

অধ্যায় ছয়: বেসরকারি চিকিৎসাসেবা খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব **৪৩**
৬.১ ভূমিকা ৪৩
৬.২ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ৪৩
৬.৩ বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ ৪৬
৬.৪ উপসংহার ৪৭

অধ্যায় সাত: উপসংহার **৪৮**
৭.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৪৮
৭.২ সুপারিশ ৪৮

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। এরই অংশ হিসেবে টিআইবি ইতোপূর্বে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়ে একাধিক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্যখাতে টিআইবি'র কাজের অংশ হিসেবে বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও তা থেকে উত্তরণের জন্য এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিতে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরি ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র সরকারের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, এবং গত কয়েক দশকে এর সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সংখ্যাগত দিক থেকে এর বিস্তৃতি ঘটলেও এ খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি বিভিন্ন প্রতিবেদনে ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে সেবা সম্পর্কিত দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের বিষয়টি বিভিন্নভাবে আলোচিত হলেও সার্বিকভাবে এ খাতের সুশাসন নিয়ে বিশেষায়িত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে এ খাতে অধিকতর টেকসই ও সুশাসিত বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা, সেবাগ্রহীতা, নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মী, এবং অন্যান্য অংশীজনের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক তাসলিমা আক্তার ও মো. জুলকারনাইন। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন নাজমুল হক ও মো. আব্দুল জলিল। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক
ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশ সরকারি স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ (২০১৫) অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৬৩.৩% বেসরকারি খাত হতে সেবা গ্রহণ করে। সেবা প্রদানে চিকিৎসকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিন (২০১৫) অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট চিকিৎসকের ৬০.২৭% বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। নিবন্ধিত বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮২ সালে নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ নার্সিং হোমের সংখ্যা ছিল ৩৩টি[১], যা ২০১৬-তে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৬৯৮টিতে দাঁড়িয়েছে।[২]

এ খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং নীতিতে এ খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০) বলা হয়, "বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, সরকারি বিধি-বিধান তৈরি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মান বিষয়ক তথ্য সেবাগ্রহীতাকে সরবরাহ নিশ্চিত করা, এবং শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল পেশাজীবী সংগঠন।"[৩] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে (২০১১) "বেসরকারি সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্যসেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা, সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য ব্যয় সহনীয় মাত্রায় রাখার ব্যবস্থা নেওয়া"র কথা বলা হয়।[৪] এছাড়া স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এইচপিএনএসডিপি) (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬) বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড নির্ধারণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।[৫]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। আলীর (২০১২) মতে বেসরকারি খাতে উচ্চ চিকিৎসা ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও মান প্রত্যাশিত সেবা না পাওয়া, জনবলের অদক্ষতা, সঠিক রোগ-নির্ণয় না হওয়া, এবং অতিরিক্ত মুনাফা বিদ্যমান।[৬] নূরুন্নবী ও ইসলামের (২০১২) মতে পেশাদারী, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, আইনের প্রয়োগ এবং নৈতিকতা ও সরকার এ খাতে জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কিত। তাঁদের গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, জবাবদিহিতা নির্ভর করে মূলত সরকারের উদ্যোগ ও বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে।[৭] গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদেও বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের চিত্র ফুটে ওঠে।[৮]

---

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.hsmdghs-bd.org (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

[২] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেলথ বুলেটিন ২০১৭ (হাসপাতাল ও ক্লিনিক ৫০২৩টি এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র ১০৬৭৫টি)

[৩] বিস্তারিত, http://www.plancomm.gov.bd/7th-five-year-plan/ (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

[৪] বিস্তারিত, www.dghs.gov.bd (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

[৫] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এইচপিএনএসডিপি) (জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬)*, ফেব্রুয়ারি ২০১২। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=150&lang=en (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)।

[৬] মু. মাহবুব আলি, 'Outbound Medical Tourism: The Case of Bangladesh', *World Review of Business Research*, Vol. 2. No. 4. July 2012. Pp. 50 – 70, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.wrbrpapers.com/static/documents/July/2012/5.%20Mahboob.pdf (২৮ জানুয়ারি ২০১৮)।

[৭] মোহাম্মদ নূরুন্নবী, সৈয়দ কামরুল ইসলাম, ২০১২, 'Accountability in the Bangladeshi privatized healthcare sector', বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.researchgate.net/publication/234018468 (২৮ জানুয়ারি ২০১৮)।

[৮] দেখুন *দৈনিক যুগান্তর*, ১২ জানুয়ারি ২০১৬; *দৈনিক প্রথম আলো*, জানুয়ারি ২৭ ২০১৬; *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; *দৈনিক যুগান্তর*, ৩ মার্চ ২০১৬; *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ মার্চ ২০১৬; *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ মে ২০১৫; *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ জুন ২০১৫; *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫; *The New Age*, February 11, 2016; *The New Nation*, February 11, 2016; *The New Age*, December 6, 2015।

তবে বেসরকারি চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচনায় বিচ্ছিন্নভাবে বলা হলেও সার্বিকভাবে বেসরকারি চিকিৎসাসেবার সুশাসন নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। টিআইবি'র কার্যক্রমে স্বাস্থ্য একটি অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক খাত। ইতোমধ্যে টিআইবি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;

২) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

৩) অনিয়ম ও দুর্নীতির পিছনে বিদ্যমান কারণসমূহ চিহ্নিত করা।

১.৪ গবেষণার আওতা

এ গবেষণায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা বলতে ব্যক্তি মালিকানাধীন নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা ও নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠান ও তাদের সক্ষমতা), প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল, অবকাঠামো, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিপণন কার্যক্রম), সেবা কার্যক্রম (চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর সেবা, রোগ-নির্ণয়, জরুরি ও বিশেষায়িত সেবা, অস্ত্রোপচার, প্রসূতি সেবা, ওষুধ, সেবার মূল্য, চিকিৎসাসেবার পরিবেশ, তথ্য প্রকাশ) এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম (নিবন্ধন ও নবায়ন, মালিকানা ও অংশীদারিত্ব, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পরিদর্শন, অভিযোগ, জরিমানা ও শাস্তি)। উল্লেখ্য, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও এ খাতে কর্মরত সকল চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিল বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও সেবাদাতা, সেবাগ্রহীতা, নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য অংশীজন (মোট তথ্যদাতা ৭০৬ জন) এবং পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, সরকারি নথিপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৫.১ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, প্রাতিষ্ঠানিক চেকলিস্ট ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন: প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে নিবন্ধিত মোট **১১৬**টি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে হাসপাতাল ও ক্লিনিক ৬৬টি এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র ৫০টি। প্রতিটি বিভাগীয় শহর, প্রত্যেক বিভাগের অধীন একটি করে আটটি জেলা শহর ও বাছাইকৃত জেলার অধীন একটি করে আটটি উপজেলা শহর (মোট ২৪টি) থেকে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়, এবং জনসংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা মহানগরীর মধ্য থেকে ২৬টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য এলাকা থেকে ৯০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের মতামত বিবেচনা করা হয়।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞ, সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য পর্যায়ের মোট ৩৯৬ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্যদাতার ধরন অনুযায়ী পৃথক পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়।

সারণি ১: মুখ্য তথ্যদাতার ধরন ও সংখ্যা

মুখ্য তথ্যদাতার ধরন	তথ্যদাতার সংখ্যা
নির্বাহী ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক (বর্তমান ও সাবেক), বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), জেলার সিভিল সার্জন, মেডিকেল অফিসার (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিভিল সার্জন অফিস),	৭২

মুখ্য তথ্যদাতার ধরন	তথ্যদাতার সংখ্যা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী, রেজিস্ট্রার (বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল), বিভাগীয় উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, পরিদর্শক ও জেলা পর্যায়ের উপ-পরিচালক (পরিবেশ অধিদপ্তর), পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সংশ্লিষ্ট অংশীজন	
চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, বিপনন কর্মকর্তা, রিসিপশনিস্ট, চিকিৎসক, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, সহকারী টেকনিশিয়ান, নার্স, আয়া, সুইপার, ওটি সহকারী	২৫০
পেশাজীবী সংগঠন: বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি (সাবেক), বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা প্রতিনিধি, জেলা পর্যায়ে মালিক সমিতি	১৯
অন্যান্য: গণমাধ্যম কর্মী, নাগরিক সমাজ, পল্লী চিকিৎসক, দালাল	৫৫

দলীয় আলোচনা: বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে জানতে বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা শহরে ৩১০ জন সেবাগ্রহীতার অংশগ্রহণে মোট ২৭টি দলগত (১৪টি পুরুষের এবং ১৩টি নারীর অংশগ্রহণে) আলোচনা পরিচালনা করা হয়। সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতার তথ্য জানতে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের অভিজ্ঞতার তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়।

পর্যবেক্ষণ: নির্বাচিত চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জনবল ব্যবস্থা, তথ্য প্রদর্শন, নথিপত্র প্রভৃতি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়।

১.৬ গবেষণার সময়

২০১৭ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো

প্রতিবেদনটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি, এবং প্রতিবেদন কাঠামো, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, তৃতীয় অধ্যায়ে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, চতুর্থ অধ্যায়ে চিকিৎসাসেবা, পঞ্চম অধ্যায়ে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সুশাসনের ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণ, এবং সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় দুই

বেসরকারি চিকিৎসাসেবার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ ভূমিকা

বাংলাদেশে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা এবং মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য 'দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২' প্রণীত হয় ১৯৮২ সালে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এর কিছু অংশ সংশোধন করা হয়। এছাড়া বেসরকারি চিকিৎসাসেবা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিস আদেশ ও পরিপত্র জারি করেছে। বেসরকারি চিকিৎসাসেবার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও নীতির মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০, চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ইত্যাদি। নিচে এসব আইন, বিধি ও নীতির পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

২.২ বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত সম্পর্কিত আইনি কাঠামো

২.২.১ দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২

এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারায় চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের শর্তাবলী, সরকারি চিকিৎসকদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্র্যাকটিস, চিকিৎসকের পরামর্শ ফি ও সার্জিক্যাল ফি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য, রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, তথ্য প্রদর্শন, পরিদর্শন ও শাস্তি প্রভৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯] অধ্যাদেশে উল্লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিচে তুলে ধরা হলো।

- **বেসরকারি ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা:** বেসরকারি ক্লিনিক বলতে এমন কোনো ক্লিনিক, হাসপাতাল অথবা নার্সিং হোম যা সরকার ছাড়া কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত, এবং যেখানে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য ভর্তির ব্যবস্থা থাকবে তা বোঝানো হয়েছে (ধারা ২)। অন্যদিকে বেসরকারি ল্যাবরেটরি বলতে সরকার ছাড়া কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান যেখানে রোগ-নির্ণয় কার্যক্রম পরিচালনা অথবা ক্লিনিক্যাল কার্যক্রম পরিচালিত হবে তা বোঝানো হয়েছে (ধারা ২)।
- **লাইসেন্স:** লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যক্তি বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে না (ধারা ৮)।
- **নিবন্ধনের শর্তাবলী:** বেসরকারি ক্লিনিক স্থাপনে নিবন্ধনের যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শয্যা অনুযায়ী সার্বক্ষণিক চিকিৎসক, নার্স ও সুইপার, সেবাগ্রহীতার জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, প্রতি সেবাগ্রহীতার জন্য ন্যূনতম ৮০ বর্গফুট জায়গা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটার, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং ভর্তিরত ব্যক্তির সার্জারি, চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিশ্চিত করা (ধারা ৯)।
- **বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান:** সরকারি চিকিৎসকদের সরকারি দায়িত্বের সময়ে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ধারা ৪)।
- **চিকিৎসক ফি ও সেবামূল্য:** পরামর্শ ফি এবং সার্জিক্যাল অপারেশন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সর্বোচ্চ মূল্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে (ধারা ৩)। পরবর্তীতে ১৯৮৪ তে এক সংশোধনীর (সংশোধনীর ধারা ৫) মাধ্যমে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি বাতিল করা হয়।
- **রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ:** প্রতিটি বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি এবং চিকিৎসক যারা বেসরকারিভাবে প্র্যাকটিস করছে, সেবাগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধকরণের জন্য রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং আদায়কৃত পরামর্শ ফি ও সেবার মূল্যের রশিদ সেবাগ্রহীতাকে মুদ্রিত ফরমে প্রদান করবে ও এর কাউন্টার ফয়েল সংরক্ষণ করবে (ধারা ৬)।
- **ফি এবং সেবার মূল্য প্রদর্শন:** পরামর্শ ফি এবং বিভিন্ন সেবার মূল্য চেম্বার, ক্লিনিক অথবা ল্যাবরেটরিতে দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে (ধারা ৭)। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এক সংশোধনীর (সংশোধনীর ধারা ৪) মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের তালিকা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনের ধারাটি পরিবর্তন করে আইনে নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে ঐ প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদর্শন করতে বলা হয়।
- **পরিদর্শন:** বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অথবা তাঁর দ্বারা নিয়োজিত যে কোনো কর্মকর্তা তাঁর পক্ষে যে কোনো বেসরকারি ক্লিনিক অথবা ল্যাবরেটরি অথবা চিকিৎসকের চেম্বার পরিদর্শন করবে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অধ্যাদেশে উল্লিখিত কোনো ধারার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে সরকারের কাছে শাস্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবে। চিকিৎসক কর্তৃক কোনো ধারার ব্যত্যয় ঘটলে চিকিৎসককে প্র্যাকটিস করা থেকে বিরত রাখার জন্য সরকারের

[৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, www.hsmdghs-bd.org/Act_Ordinance.htm (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

কাছে সুপারিশ করতে পারবে। ক্লিনিকের ক্ষেত্রে এর লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে, তবে ক্লিনিকের মালিককে কেনো লাইসেন্স বাতিল করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে এটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করবে। পরবর্তীতে সরকার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশের প্রেক্ষিতে মেডিকেল চিকিৎসককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্র্যাকটিস করা থেকে বিরত রাখবে, এবং ল্যাবরেটরি বন্ধ করে দেবে। তবে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং চিকিৎসককে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা হবে (ধারা ১১)।

- **শাস্তি:** চিকিৎসক অথবা বেসরকারি ল্যাবরেটরির মালিক কর্তৃক অধ্যাদেশের যে কোনো ধারার লঙ্ঘনে শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি ক্লিনিকের মালিক কর্তৃক অধ্যাদেশের যে কোনো ধারার লঙ্ঘনে শাস্তি হিসেবে ছয় মাসের কারাবাস অথবা পাঁচ হাজার টাকা অথবা উভয় দণ্ডের উল্লেখ রয়েছে [ধারা ১৩ (১) ও (২)]।

২.২.২ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০

'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০'-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এই আইনের দ্বারা বিএমডিসি মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা ও ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক ও ডেন্টাল চিকিৎসকদের নিবন্ধন, নিবন্ধন ছাড়া চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ভুয়া পদবি, ডিগ্রি, প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব অথবা নিবন্ধন ইত্যাদির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক ও ডেন্টাল চিকিৎসকদের জন্য অনুসরণীয় পেশাগত আচরণের মান ও তৎসম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।[১০] উক্ত আইনে উল্লিখিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ধারা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- **স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক:** স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক বলতে এই আইনের অধীন স্বীকৃত কোনো মেডিকেল চিকিৎসককে বোঝায় [ধারা ২ (১৮)]। বিএমডিসি পেশাদার ও স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসকদের নিবন্ধন, তাঁদের নাম ও প্রয়োজনীয় বিবরণসহ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং উক্ত রেজিস্টার প্রকাশ ও সংরক্ষণ করবে [ধারা ১৮ (১) ও (২)]।
- **নিবন্ধন বাতিল ও রেজিস্টার হতে নাম প্রত্যাহার:** নিবন্ধিত কোনো পেশাদার মেডিকল চিকিৎসক, ডেন্টাল চিকিৎসক বা মেডিকেল সহকারী এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন বা নির্ধারিত পেশাগত আচরণ বা নীতিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘনের কারণে দোষী সাব্যস্ত হলে বিএমডিসি উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলক্রমে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার হতে তাঁর নাম প্রত্যাহার করতে পারবে [ধারা ২৩ (১)]।
- **প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বা নিবন্ধনের দণ্ড:** যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একজন স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক হিসেবে এই আইনের অধীন নিবন্ধন অথবা নিবন্ধন করার উদ্যোগ গ্রহণ অথবা মিথ্যা বা প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করে অথবা মৌখিক বা লিখিতভাবে উক্তরূপ ঘোষণা করে, তা হলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হবে একটি অপরাধ, এবং এর জন্য তিন বৎসর কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে [ধারা ২৮ (১)]।
- **ভুয়া পদবি ব্যবহার:** নিবন্ধিত কোনো মেডিকেল চিকিৎসক এমন কোনো নাম, পদবি, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করবে না যাতে তাঁর অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে বলে কেউ মনে করতে পারে, যদি না তা কোনো স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা বা স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা হয়ে থাকে। ন্যূনতম এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রি প্রাপ্তগণ ব্যতিত অন্য কেউ তাঁদের নামের পূর্বে চিকিৎসক পদবি ব্যবহার করতে পারবে না। বিধানটি লঙ্ঘন করা হলে তিন বৎসর কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবে এবং উক্ত অপরাধ অব্যাহত থাকলে প্রত্যেকবার এর পুনরাবৃত্তির জন্য অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বর্ণিত দণ্ডের অতিরিক্ত হিসেবে দণ্ডনীয় **হবে** [ধারা ২৯ (১)]।
- **পরিদর্শন:** কাউন্সিল স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা, অথবা ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতার জন্য আবেদনকারী মেডিকেল প্রতিষ্ঠান বা ডেন্টাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট মেডিকেল প্রতিষ্ঠান বা ডেন্টাল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পাঠ্যসূচি, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে। কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিকেল পরিদর্শক ও ডেন্টাল পরিদর্শক নিয়োগ করতে পারবে এবং উক্ত পরিদর্শকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা এর পরীক্ষা পরিচালনা বা অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি, শিক্ষণের মান ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রদান করবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত প্রতিবেদনের এক কপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মেডিকেল প্রতিষ্ঠান বা ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করবে এবং এই বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত মন্তব্যসহ প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করবে [ধারা ২৭ (১), (২), (৩)]।

[১০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,
http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=79&lang=en (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

- **চিকিৎসকদের পেশাগত আচরণ:** উক্ত আইনের (ধারা ৫) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কাউন্সিল চিকিৎসকদের পেশাগত আচরণ ও তৎসম্পর্কিত নীতি সম্পর্কিত 'কোড অব প্রফেশনাল কনডাক্ট' প্রণয়ন করে। পেশাগত আচরণ ও নীতিতে (কোড অব প্রফেশনাল কনডাক্ট) সেবাগ্রহীতার চিকিৎসাসেবা সম্পর্কিত মেডিকেল রেকর্ড সংরক্ষণ ও গোপনীয়তা রক্ষা, সেবাগ্রহীতার সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও বিশ্বস্ততা স্থাপন, পেশাগত চর্চার ক্ষেত্রে চিকিৎসক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ ও প্রচারণা, চিকিৎসকদের যোগ্যতার যথার্থ ব্যবহার, ব্যক্তিগত স্বার্থে আর্থিক সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।[১১]

২.২.৩ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯

ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করার লক্ষ্যে প্রণীত আইনটি 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' নামে অভিহিত। এই আইন অনুসারে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য ভোক্তার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো।[১২]

- **সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন:** কোনো ব্যক্তি আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করে তার দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ না করলে বা সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে উক্ত তালিকা প্রদর্শন না করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা ৩৯)।
- **মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ওষুধ বিক্রয়:** কোনো ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য বা ওষুধ বিক্রয় করলে বা করতে প্রস্তাব করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা ৫১)।
- **সেবাগ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য:** কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপাত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কোনো কার্য করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা ৫২)।
- **অবহেলা, ইত্যাদি দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য, জীবনহানি:** কোনো সেবা প্রদানকারী অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতার জন্য সেবাগ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানী ঘটালে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (ধারা ৫৩)।
- **ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা:** অনুষ্ঠিত বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য উক্ত আইনে অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড আরোপ করতে পারবেন (ধারা ৬৩)।

২.২.৪ মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯

এই আইন অনুসারে সরকার সমগ্র দেশে কিংবা যে কোনো জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় যে কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে যে কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে, এবং এর স্বার্থে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে নিয়ে দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে কিংবা যে কোনো জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ কার্যক্রম পরিচালিত করা হয় যা 'মোবাইল কোর্ট' নামে অভিহিত। মোবাইল কোর্ট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন (যেমন ভোক্তা অধিকার আইন, মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন) অনুসরণ করে ভোক্তা হিসেবে সেবাগ্রহীতার অধিকার সংরক্ষণ ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।[১৩] এই আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক দণ্ড আরোপের ক্ষমতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

- **দণ্ড আরোপ:** দণ্ড আরোপ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে দণ্ডই নির্ধারিত থাকুক না কেনো, দুই বছরের অধিক কারাদণ্ড এই আইনের অধীন আরোপ করা যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে অর্থদণ্ড নির্ধারণ রয়েছে,

---

[১১] বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, Code of Professional Conduct, Etiquette and Ethics, বিস্তারিত, http://bmdc.org.bd/etiquette-and-ethics/ (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

[১২] বিস্তারিত, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name=&vol=%E0%A7%A9%E0%A7%AF&id=1014 (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

[১৩] বিস্তারিত, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name=&vol=%E0%A7%A9%E0%A7%AF&id=1025 (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

উক্ত অর্থদণ্ড বা অর্থদণ্ডের নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করা যাবে। ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন যে পদ্ধতিতে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড আদায়যোগ্য বা আরোপনীয় হয়ে থাকে, এই আইনের অধীন অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড অনুরূপ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য ও আরোপনীয় হবে (ধারা ৮ এর ১, ২ ও ৩)।

- **অর্থদণ্ড আদায়:** কোনো অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে দোষী সাব্যস্ত করে কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা হলে উক্ত অর্থদণ্ডের নির্ধারিত টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায়যোগ্য হবে। আরোপিত অর্থদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা না হলে অনাদায়ে আরোপিত কারাদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে এবং অর্থদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করতে ব্যর্থতার কারণে আরোপনীয় বিনাশ্রম কারাদণ্ড তিন মাসের অধিক হবে না। কারাদণ্ড ভোগ করার সময় অভিযুক্তের পক্ষে অর্থদণ্ডের সমুদয় অর্থ আদায় করা হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবাস হতে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিলাভ করবে (ধারা ৯ এর ১, ২, ৩ ও ৪)।

২.২.৫ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭

সরকার 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫' এর ধারা ২০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭' প্রণয়ন করে।[১৪] এই বিধিমালায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন বিধি আলোচনা করা হলো।

- **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান:** পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ চারটি শ্রেণিতে (সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল) ভাগ করা হয়। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবকে কমলা-খ শ্রেণি এবং হাসপাতালকে লাল শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণিভুক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম অবস্থানগত এবং পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে (বিধি ৭)। অবস্থানগত ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রতিষ্ঠানটি যে স্থানে কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে, কার্যক্রম শুরু করার মতো অবস্থান রয়েছে কি না অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে ধরনের বর্জ্য উৎপন্ন হবে তা ঐ এলাকার পরিবেশের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে কি না তা বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করানো), প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম (ভবন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানে জেনারেটর কোথায় বসানো হবে, অপারেশন থিয়েটার, হাসপাতালে ভর্তির জন্য রোগীর শয্যার সংখ্যা, বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ইত্যাদি নথিপত্র সংযুক্ত করতে হবে। পরবর্তীতে ইটিপি স্থাপন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ:** বায়ু, পানি, শব্দ এবং ঘ্রাণসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নিয়ন্ত্রণে হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত/ চিহ্নিতব্য/ বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনা হতে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এবং নীরব এলাকায় যানবাহনের হর্ণ বা অন্য প্রকার সংকেত ধ্বনি এবং লাউড স্পীকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে (বিধি ১২)।

২.২.৬ চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫' এর ধারা ২০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (বর্জ্য পরিবহন, মজুদকরণ, নথি সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান) ও প্রক্রিয়াজাতকরণের (বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, বিণষ্টকরণ, ভষ্মীকরণ, পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ) জন্য 'চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮' প্রণয়ন করা হয়। এখানে চিকিৎসাসেবা স্থল বলতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা, যেমন সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল, কসনালটেশন চেম্বার, বেসরকারি ক্লিনিক, নার্সিং হোম, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, ডিসপেনসারী, ওষুধের দোকান, ব্লাড ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে। এই বিধিমালায় উল্লিখিত উল্লেখযোগ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।[১৫]

- **কর্তৃপক্ষ গঠন:** বিধিমালা জারি হওয়ার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক বিভাগে 'কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠিত হওয়ার কথা যেখানে বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) সভাপতি, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি সদস্য, এবং মহা-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি সদস্য-সচিব থাকবেন (বিধি ৩)। এই কর্তৃপক্ষের **দায়িত্ব ও কর্তব্য** হচ্ছে বিধিমালার অধীন চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং প্রয়োজনে বাতিল করা; লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা; দখলদার কর্তৃক চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারী করা; চিকিৎসা-বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য

[১৪] বিস্তারিত, http://www.doe.gov.bd/site/view/policies (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

[১৫] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮, ২ নভেম্বর ২০০৮; এস.আর.ও. নং ২৯৪-আইন/২০০৮।

সংগ্রহ, প্রকাশ, প্রচার ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা, দখলদার কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে মহা-পরিচালকের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (বিধি ৪)।

- **লাইসেন্সের ধরন:** এই বিধিমালার আওতায় তিনধরনের লাইসেন্স দেওয়া হয় - (১) চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, মজুদকরণ, বিনষ্টকরণ ও ভস্মীকরণ লাইসেন্স; (২) চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন লাইসেন্স; (৩) চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ লাইসেন্স (বিধি ৫)। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ ছাড়া কোনো দখলদার চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাত করতে পারবে না। তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উক্তরূপ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত বিধির কোনো কিছু প্রযোজ্য হবে না।
- **লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:** প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদারকে চিকিৎসা-বর্জ্য স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর যাতে কোনো বিরূপ প্রভাব না ফেলে সেজন্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিতকরণে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা, কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা, চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত বা এরূপ কর্মকাণ্ডে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে এর ক্ষতিকারক দিক হতে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, চিকিৎসা-বর্জ্য বিনষ্ট ও শোধনের "আদর্শ মান" বজায় রেখে অসংক্রামিত অবস্থায় চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট বার্ষিক নথিপত্র অন্যূন্য তিন বছরের জন্য সংরক্ষণ করা, এবং পূর্ববর্তী বছরের চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণি ও পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক/অনুমোদিত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে প্রেরণ করা (ধারা ৬)।
- **চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন-বিশোধন-অপসারণ:** চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব হচ্ছে সময়ভিত্তিক মানদণ্ড প্রতিপালনপূর্বক চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন, অপসারণ বা বিনষ্ট করা, যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করা অথবা বর্জ্য বিশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, চিকিৎসা-বর্জ্যের পাত্রের গায়ে সহজে বোধগম্য বাংলা ভাষায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত চিকিৎসা-বর্জ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করা, ক্ষতিকারক চিকিৎসা-বর্জ্য অসংক্রামিত অবস্থায় অপসারণ করা (ধারা ৯)।
- **চিকিৎসা-বর্জ্যের সংরক্ষণ ও অপসারণে পাত্র ও কালার কোড:** "কালার কোড" বলতে চিকিৎসা-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অংশ হিসেবে চিকিৎসাসেবা স্থলে উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক পাত্র (কালো, হলুদ, লাল, নীল, সিলভার, সবুজ) ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে (ধারা ২)।[১৬]
- **উপদেষ্টা কমিটি গঠন:** চিকিৎসা-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং চিকিৎসা-সেবা, পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা ও পৌর প্রশাসন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ এবং এ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি চিকিৎসা-বর্জ্যের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক নীতিমালা বা এ সংক্রান্ত বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং এ বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে সময়ে সময়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে (বিধি ১৬)।
- **শাস্তি:** কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে এরূপ লঙ্ঘন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে (বিধি ১১)।

২.২.৭ পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭

বিকিরণ স্থাপনা, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, বিকিরণ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের লাইসেন্স প্রদান করা হয় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশন থেকে।[১৭]

---

[১৬] **কালো পাত্রে** ব্যবহার্য কাগজ/ মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, খালি বাক্স ও কৌটা, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, অসংক্রামিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, কাপড়, গজ, তুলা, ফলমূলের খোসা, রান্না ঘরের আবর্জনা, ডিমের খোসা, কাচের খালি বোতল ইত্যাদি; **হলুদ পাত্রে** রক্ত/ পুঁজ/ দেহরস দ্বারা সংক্রামিত বর্জ্য (গজ, ব্যান্ডিজ, তুলা, স্পঞ্জ, ক্যাথিটার ইত্যাদি), রক্ত সঞ্চালনের ব্যাগ/টিউব, রক্ত দ্বারা সংক্রামিত স্যালাইট সেট, ডায়রিয়া রোগীর সংক্রামিত কাপড়, সংক্রামিত সিরিঞ্জ ইত্যাদি, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (টিস্যু, টিউমার, গর্ভফুল, গর্ভপাত/ গর্ভসংক্রান্ত বর্জ্য ইত্যাদি), সংক্রামিত বা ব্যবহার উত্তীর্ণ ওষুধ, বিভিন্ন প্রকারের রি-এজেন্ট, ডায়ালাইসিস এ ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি এবং পরীক্ষার জন্য দেওয়া রক্ত/ কফ/ মল/ সিরাম/ শরীরের নিঃসরণ ইত্যাদি; **লাল পাত্রে** মেডিকেল ব্যবহৃত সকল প্রকার সুঁই, ব্লেড, ভাঙ্গা স্লাইড, ভাঙ্গা বোতল/ কাঁচ/ টেস্টটিউব, অর্থোপেডিক কাজে ব্যবহৃত স্ক্রু, স্টীল প্লেট, পিন ইত্যাদি; **নীল পাত্রে** ব্যবহৃত পানি, পানের পিক, বমি, কফ, সাকশন করা তরল, পূজ, দেহ রস, গর্ভের পানি, সিরাম, তরল পদার্থ, অব্যবহৃত তরল ওষুধ ইত্যাদি; এবং **সবুজ পাত্রে** পুনঃব্যবহারযোগ্য ব্যবহার্য কাগজ/ মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, খালি বাক্স ও কৌটা, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, অসংক্রামিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, কাপড়, গজ, তুলা, কাচের খালি বোতল ইত্যাদি।

[১৭] বিস্তারিত, http://www.baec.gov.bd (২৩ নভেম্বর ২০১৭)।

- **বিকিরণ সীমা:** যে কোনো কর্মীর পেশাগত সম্পাত অবিচ্ছিন্ন পাঁচ বছরের গড় হিসাবে বছর প্রতি কার্যকরী বিকিরণ মাত্রা ২০ মিলি সিভার্ট (mSv) এবং কোনো একক বছরের কার্যকরী বিকিরণ মাত্রা ৫০ মিলি সিভার্ট (mSv) অতিক্রম করবে না তা লাইসেন্সধারী নিশ্চিত করবে (বিধি ২০.৩)।
- **বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা:** লাইসেন্সধারী অথবা একজন নিয়োগকারী কমিশনের অনুমোদনক্রমে তার প্রত্যেকটি বিকিরণ স্থাপনার জন্য নিজেকে অথবা তার নিয়োগকৃত একজন যোগ্য ব্যক্তিকে বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করবে (বিধি ৫৪)।
- **পেশাগত সম্পাত:** পেশাগত সম্পাত অর্থ উৎসসমূহ হতে সম্পাত ব্যতীত সকল প্রকার সম্পাত যা কোনো ব্যক্তি পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আয়নায়নকারী বিকিরণ হতে লাভ করে থাকে (বিধি ৪৩)।
- **কর্মীদের স্বাস্থ্য ইতিহাস সংরক্ষণ:** লাইসেন্সধারী উক্ত বিধিমালার চাহিদা অনুযায়ী সম্পাতপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মীর স্বাস্থ্য রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে (বিধি ৭৫.১)।
- **পরিদর্শন:** লাইসেন্সের শর্তাবলী অথবা এই বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত কোনো কার্যক্রম যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য কমিশন তৎকর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করাতে পারবে। পরিদর্শন নোটিশ দ্বারা বা বিনা নোটিশে হতে পারে এবং কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি এবং এর কার্য পরিচালনার ভিত্তিতে কমিশন পরিদর্শনের হার নির্ধারণ করবে (বিধি (৯১.১)।

২.২.৮ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূলনীতি ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়।[১৮] জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লিখিত বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো।

- **প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরি:** বেসরকারি ও এনজিও সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্যসেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা এবং বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীদের সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে (কর্মকৌশল ১৬)।
- **চিকিৎসা ব্যয়:** পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (কর্মকৌশল ১৬)।
- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ:** সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে এবং দেশব্যাপি তা বিস্তার করা হবে (কর্মকৌশল ২৩)।
- **চিকিৎসকদের পেশাগত মান ও নৈতিক চর্চা:** মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের নিবন্ধন, পেশাগত মান এবং নৈতিক চর্চা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে তদারকি করার জন্য বিএমডিসি'কে আরও শক্তিশালী করা হবে (কর্মকৌশল ২৬)।
- **তথ্য ব্যবস্থাপনা:** একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদারকির জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে (কর্মকৌশল ১৩)।

২.৩ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাসেবার মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার মাধ্যমে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন, নবায়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে তদারকি ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং জেলার সিভিল সার্জনগণ এসব প্রতিষ্ঠানের নবায়ন এবং পরিদর্শন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর নবায়ন সরাসরি বিভাগীয় অফিস (স্বাস্থ্য) প্রদান করে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র ও ব্লাড ব্যাংকের নতুন লাইসেন্স মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদনের পর লাইসেন্স ইস্যু করবেন পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) এবং এসব প্রতিষ্ঠানের নবায়ন করা হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালকের (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) কাছ থেকে।[১৯]

২.৩.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যপরিধি

চিকিৎসাসেবা প্রদানে (মেডিকেল প্র্যাকটিস) এবং বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরির সংক্রান্ত ১৯৮২ সনের অধ্যাদেশসহ ভবিষ্যতে অনুরূপ সকল অধ্যাদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য বিধি-বিধানসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা, এবং স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব। হাসপাতাল সেবা ও ক্লিনিক সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ সম্পাদনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা পরিচালককে সহায়তা প্রদান করা এবং বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রসমূহের লাইসেন্স

[১৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.mohfw.gov.bd।

[১৯] স্মারক নং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/বিবিধ-২/১৪৩২, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

প্রদান ও নবায়নসহ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত তদারকি ও মনিটরিং করা হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালকের দায়িত্ব। সিভিল সার্জনের কাজ হচ্ছে জেলা ও এর নিম্ন পর্যায়ে কাজ করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপ-পরিচালকের কাজে সহায়তা প্রদান, জেলার সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথোপযুক্তভাবে হচ্ছে কি না তার নিশ্চয়তা বিধান করা, এবং সময় সময় সেগুলো পরিদর্শন করা বা নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো দেখাশোনা করা।[২০]

চিত্র ১: বেসরকারি চিকিৎসাসেবার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাঠামো

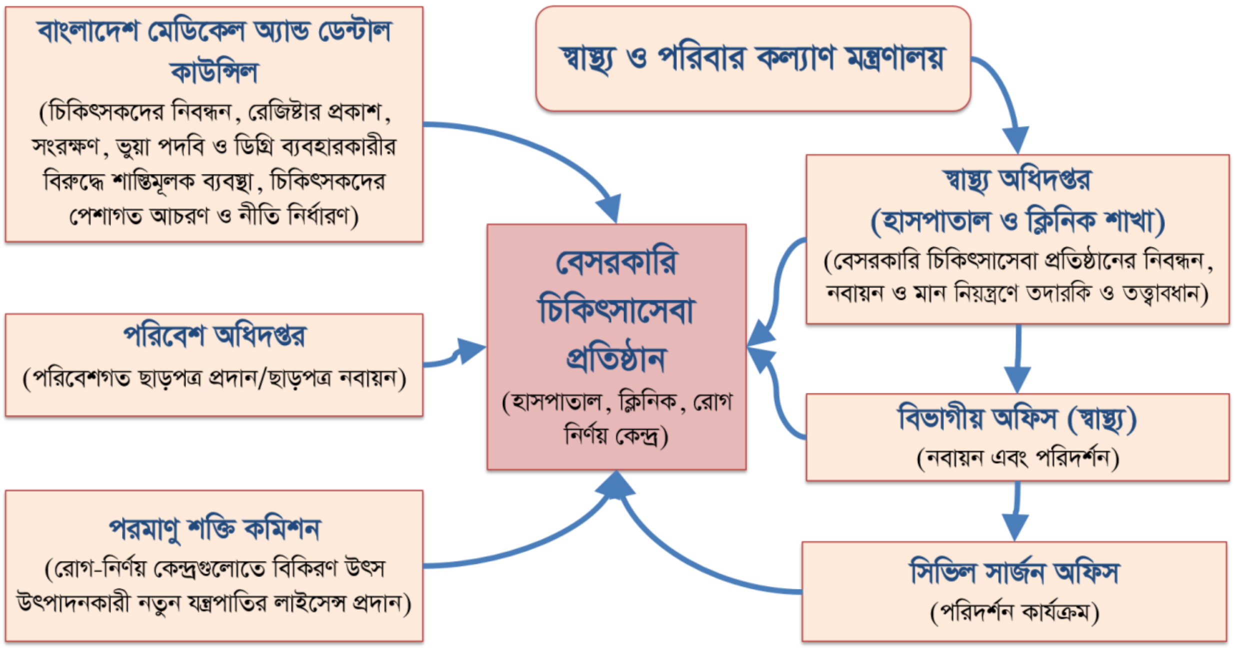

২.৩.২ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত জনবল

ঢাকা মহানগরীর মধ্যে অবস্থিত সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন সাতজন (পরিচালক একজন, উপ-পরিচালক দুইজন, সহকারী পরিচালক দুইজন, এবং মেডিকেল কর্মকর্তা দুইজন)। বিভাগীয় পর্যায়ে এই দায়িত্ব পালন করেন চারজন যার মধ্যে রয়েছেন সভাপতি হিসেবে বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিভিল সার্জন (সদস্য সচিব), সহকারী পরিচালক (স্বাস্থ্য)-সদস্য, এবং মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজিস্ট/ সার্জারি/ রেডিওলজি বিভাগের কনসালট্যান্ট বা সহকারি অধ্যাপক মর্যাদার যে কোনো একজন প্রতিনিধি (সদস্য)। জেলা পর্যায়ে এই দায়িত্ব পালন করেন তিনজন যার মধ্যে রয়েছেন সিভিল সার্জন (সভাপতি), মেডিকেল অফিসার (সিভিল সার্জন)-সদস্য, এবং সদর হাসপাতালের কনসালটেন্ট।

২.৪ বেসরকারি চিকিৎসাসেবার আইনি সীমাবদ্ধতা

উপরোল্লিখিত আইন, বিধি ও নীতি পর্যালোচনা করে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধান আইন 'দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২' প্রণয়নের পর এখন পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয় নি, এবং এই আইনের কোনো বিধিমালাও করা হয় নি। কার্যত নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা নিয়ে নতুন আইনের খসড়া প্রথম ২০০৭ সালে করা হয়। এরপর ২০১০ সালে আরেকটি আইনের খসড়া করা হয়। এই দুই আইনের সমন্বয় করে ২০১৪ সালে একটি খসড়া তৈরি হয়।[২১] পরবর্তীতে ২০১৬ সালে 'রোগী সুরক্ষা আইন, ২০১৪' এবং 'চিকিৎসাসেবা দানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা আইন, ২০১৪' এই দুটি আইন মিলিয়ে 'বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইন ২০১৬' এর খসড়া তৈরি করা হয়।[২২] এই খসড়া আইনটি সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় প্রতিবেশি দেশসমূহে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা করে অধিকতর সমৃদ্ধ খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি

[২০] বিস্তারিত, http://www.dghs.gov.bd/index.php/bd/home/২৩২১-২০১৬-০১-০৩-১০-৫৯-০৪
[২১] *Dhaka Tribune*, 'Draft law for private hospital nearly ready', 3 July 2014।
[২২] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, 'আটকে আছে স্বাস্থ্য খাতের আট আইন', ২৩ আগস্ট ২০১৬।

কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে 'বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইন ২০১৬' এর খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে সকল অংশীজনের সমন্বয়ের ঘাটতি, আইন প্রণয়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এখনো এটি চূড়ান্ত হয় নি।

এছাড়া প্রায়ই চিকিৎসক কর্তৃক অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেলেও এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ করার কোনো বিধান নেই। অন্যদিকে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়শই সেবা সম্পর্কিত বিষয় (সেবাগ্রহীতার মৃত্যু ও অন্যান্য) নিয়ে চিকিৎসক, হাসপাতালের কর্মরত ব্যক্তি ও সেবাগ্রহীতার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাক বিতণ্ডা, মারামারি এবং হাসপাতাল ভাংচুরের মতো ঘটনা ঘটলেও সেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তা এবং প্রতিষ্ঠান সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন নেই। সরকারের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বা খাত নিয়ে কোনো বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয় নি।

বক্স ১: সেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তার অভাব

"একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একজন ব্যক্তির ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত সেবাগ্রহীতা মারা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর করা হয় এবং বহির্বিভাগের ইনচার্জকে মারধর করা হয়। স্থানীয় কিছু লোকজনও সেবাগ্রহীতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে একত্র হয়ে ভাংচুর করে। তবে প্রতিষ্ঠান মনে করে এক্ষেত্রে যে চিকিৎসকের অবহেলা নেই তাও ঠিক নয়। তবে অবহেলা থাকলে তার বিচার হবে, কিন্তু ভাংচুর এবং কাজের পরিবেশ ব্যহত করা ঠিক নয়। এ বিষয়ে আইন করতে হবে এবং কাজের পরিবেশ নিরাপদ করতে হবে।"

তথ্যসূত্র: *ঢাকার একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সাক্ষাৎকার*

নিচে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতির উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হলো।

২.৪.১ দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশনস) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২

'দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশনস) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২' অনেক পুরানো হওয়ায় অধ্যাদেশে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয় বাস্তব প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য নয়। এই অধ্যাদেশের উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা হলো -

- **নিবন্ধন ও নবায়ন:** সেবার ধরন অনুযায়ী বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় নি এবং সে সংজ্ঞা অনুযায়ী সেবার আওতা নির্ধারণ করা হয় নি। বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর লাইসেন্স নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র নিতে হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি। তাছাড়া চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কতদিন পর নবায়ন করতে হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ নেই।
- **অবকাঠামো ও জনবল:** প্রতিষ্ঠানভেদে সেবার ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম মান (আবশ্যিক ইউনিট, এর অবকাঠামো, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা, শয্যা অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য জনবল) সম্পর্কে বলা হয় নি। রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের সেবাপ্রদানকারীর ন্যূনতম সংখ্যা, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে বলা হয় নি।
- **স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ:** সেবাগ্রহীতার জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের (ধারা ৯) কথা বলা হলেও কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।
- **সেবার মূল্য:** অধ্যাদেশে উল্লিখিত সেবার মূল্য বর্তমান সময়ের জন্য বাস্তবসম্মত নয়। অধ্যাদেশে সার্জিক্যাল অপারেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবার মূল্য (অপারেশন চার্জ, ওষুধ, এনেসথেসিয়া চার্জসহ সাধারণ ডেলিভারি) এবং রেডিওলজি ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে বলা হলেও (ধারা ৩) তা হালনাগাদ করা হয় নি। তাছাড়া কোনো কোনো সেবা, যেমন শয্যা, ভর্তি ফি ইত্যাদির মূল্য সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয় নি। অধ্যাদেশে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সম্পর্কে বলা হলেও সংশোধনী ১৯৮৪ (ধারা ৫) এর মাধ্যমে এটি বাতিল করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সুনির্দিষ্ট কোনো আইন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত করা হয় নি। পরামর্শ ফি এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত বিভিন্ন সেবার মূল্য চেম্বার, ক্লিনিক এবং পরীক্ষাগারে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের (ধারা ৭) কথা বলা হলেও সংশোধনী ১৯৮৪ এর (ধারা ৪) মাধ্যমে তা শিথিল করা হয়।
- **তথ্য সংরক্ষণ:** নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য (নিবন্ধন ও নবায়ন, পরিদর্শন, জনবল ইত্যাদি) সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। এছাড়াও চিকিৎসক এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাগ্রহীতার সেবা সম্পর্কিত তথ্য (রোগের ধরন, প্রদত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধ, জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যা, প্রসূতি সেবা ইত্যাদি) সংরক্ষণ সম্পর্কে কোনো দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় নি।
- **শাস্তি:** বিদ্যমান আইনে শাস্তির পরিমাণ বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে খুব কম। তাছাড়া সেবা প্রদানে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনিয়মের প্রেক্ষিতে সেবাগ্রহীতা কোথায় অভিযোগ করবে সে সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় নি।

২.৪.২ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০

চিকিৎসকদের ভুয়া পদবির ব্যবহার এবং নিবন্ধিত না হয়েও নিজেকে এই আইনের অধীন একজন নিবন্ধিত মেডিকেল চিকিৎসক বলে (ধারা ২৮) প্রতারণা করে এরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসকদের পরিদর্শন করার বিষয়টি এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

২.৪.৩ জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১

এই নীতিতে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগীদের সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে বলা হলেও তা করা হয় নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা সারাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে যা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদারকির জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলা হলেও এখনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। চিকিৎসকদের নিবন্ধন, পেশাগত মান এবং নৈতিক চর্চা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে তদারকি করার জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলা হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি পর্যাপ্ত নয়। সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে ও দেশব্যাপি তা বিস্তার করার কথা বলা হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি পর্যাপ্ত নয়।

২.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বলা যায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় আইন থাকলেও তা হালনাগাদ না করার ফলে এ অধ্যাদেশে উল্লিখিত সেবার মূল্য ও শাস্তি বাস্তব প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য নয়। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রধান আইনের নিবন্ধন, অবকাঠামো, জনবল, সেবার মূল্য, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ, অভিযোগ ও শাস্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়।

অধ্যায় তিন

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

৩.১ ভূমিকা

এ অধ্যায়ে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিভিন্ন ক্ষেত্র (নিবন্ধন ও নবায়ন, জনবল, অবকাঠামো, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, বিপণন) আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ নিবন্ধন

৩.২.১ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান মুনাফা-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় অনেকেই এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত বলে দেখা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী (পুলিশ, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্স), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, চিকিৎসকের স্ত্রী, রাজনীতিবিদ, মেডিকেল প্রতিনিধি, প্রবাসী, ব্যবসায়ী (ট্রাভেল এজেন্সির মালিক, সিরামিক কারখানার মালিক), কর্পোরেট গ্রুপ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পল্লী চিকিৎসক, শিক্ষক, ওষুধ বিক্রেতা, গৃহিণী ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের সংখ্যা সর্বনিম্ন দুইজন থেকে সর্বোচ্চ ১৮৮ জন পর্যন্ত।

একদিকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অংশীদার হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিক ও সাংবাদিক, এবং অন্যদিকে সেবাগ্রহীতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্স, পল্লী চিকিৎসক, মেডিকেল প্রতিনিধিদের মালিক বা অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সরকারি হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে যুক্ত থাকে এবং সরকারি হাসপাতাল থেকে সেবাগ্রহীতাদের তাদের মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সেবা নেওয়ার জন্য বাধ্য করে। এ প্রসঙ্গে জেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক (যিনি মালিক সমিতির সেক্রেটারি) জানান ঐ শহরে যেসব ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে সেগুলোর মালিক হচ্ছে ওয়ার্ড বয়, নার্স, এবং টেকনিশিয়ান এবং এটি ৮০% প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি বিভাগীয় শহরের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন গণমাধ্যম কর্মী জানান সরকারি হাসপাতালে যেসব টেকনিশিয়ান ও নার্স আছে তাদের ৭০% কোনো না কোনো ক্লিনিক বা রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের মালিক।

৩.২.২ নিবন্ধন প্রক্রিয়া

আইন অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু করার আগে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন করার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং জেলার সিভিল সার্জনকে অবহিত করে। পরিদর্শন দলের ইতিবাচক সুপারিশের প্রেক্ষিতে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এক বছরের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জারিকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী নতুন লাইসেন্স এর আবেদন করেই কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না; এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেলে তা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবগত করতে হবে,[২৩] এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আবেদনপত্র দাখিল করেই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা সরকারি নীতিমালা বহির্ভূত এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।[২৪] কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের অনুমোদন না নিয়েই চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু করে।

সারা দেশে অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কতগুলো তা কর্তৃপক্ষের জানা নেই। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, দেশে যে পরিমাণ সরকারি অনুমেদানপ্রাপ্ত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে তার থেকে কয়েকগুণ বেশি অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক রয়েছে এবং এ সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে, এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে চালু করা হয়েছে।[২৫] একটি বিভাগীয় শহরের প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ঐ শহরে প্রায় ৫০টির মতো অনুমোদনহীন ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে।

---

[২৩] স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/হাসঃ/প্রাঃ কিঃ ল্যাবঃ/বিবিধ/১৬/, ০৮ নভেম্বর ২০১৬।

[২৪] স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/হাসঃ/প্রাঃ কিঃ/বিবিধ/১৫/১৩৩৩, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

[২৫] *আমাদের সময়*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

৩.২.৩ পরিবেশের ছাড়পত্র

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) অনুযায়ী হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরিকে পরিবেশের ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায়, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয় নি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৭টি)। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান, "প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মিত ভবনে স্থাপন করা হয় নি, ভাড়া নেওয়া বাড়িতে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাই ছাড়পত্র নেই।" একটি বিভাগীয় পর্যায়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক, ভারপ্রাপ্ত) জানান যে উক্ত বিভাগীয় শহরের প্রায় ৯০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের ছাড়পত্র নেই। একটি জেলার পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক) জানান তাঁর আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১১টি প্রতিষ্ঠান পরিবেশের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছে, যার মধ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান পরিবেশের ছাড়পত্র পেয়েছে। উল্লেখ্য, সারা দেশে কতগুলো বেরসকারি হাসপাতাল পরিবেশের ছাড়পত্র পেয়েছে সেই তথ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে পাওয়া যায় নি।

৩.২.৪ চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের স্থান

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান (যার মধ্যে হাসপাতাল এবং ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব অন্তর্ভুক্ত) আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হতে পারবে না।[২৬] তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কিছু আবাসিক এলাকা নির্ধারণ করা থাকলেও এর বাইরের এলাকার ক্ষেত্রে আবাসিক এলাকা নির্ধারণ করা নেই। আবাসিক এলাকা বলতে শুধু মানুষের বসবাসের এলাকা বোঝায় যেখানে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না। অর্থাৎ চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিচে বা ওপরে একই ভবনে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা আবাসিক ব্যবস্থা থাকতে পারবে না।

তবে গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচিত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪২টি প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ২২টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই ভবনে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কোথাও কোথাও হাসপাতালের ওপরে আবাসিক ভবন এবং নিচতলার একাংশ মার্কেট এবং অপর অংশ পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার কোথাও তিনতলা ভবনের নিচতলায় রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র, বাকি দুইতলা আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার কোথাও একটি ভবনের দুইটি তলা ভাড়া নিয়ে হাসপাতাল করা হয়েছে এবং এর নিচেই একটি কমিউনিটি সেন্টার অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানা যায়, বর্তমানে যেসব হাসপাতাল বা ক্লিনিক রয়েছে এগুলোর কয়েকটি ব্যতীত ৯০% বা তার বেশি আবাসিক এলাকাতে এবং ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত এবং যে ভবনে হাসপাতাল বা ক্লিনিক করা হচ্ছে এর জন্য আলাদা করে ডিজাইন করা নেই।

৩.২.৫ বিশেষায়িত সেবা প্রদানে অনুমোদন

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধনের সময় জেনারেল মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি অ্যান্ড অবস্ সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদন নিলেও পরবর্তীতে আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ, কার্ডিয়াক প্রভৃতি ধরনের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে এবং এ ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমোদন গ্রহণ করে নি। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি হাসপাতালের মধ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠান বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে। এর মধ্যে শুধু আইসিইউ সেবার ব্যবস্থা আছে ১৮টি প্রতিষ্ঠানে। এর বাইরেও কিছু কিছু কর্পোরেট হাসপাতালে সিএসআইসিইউ, পিআইসিইউ, এসআইসিইউ, সিআইসিইউ ইত্যাদি সেবার ব্যবস্থা আছে, যদিও এর জন্য অনুমোদন নেওয়া হয় নি।

৩.২.৬ বর্ধিত শয্যার জন্য অনুমোদন

চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর শয্যা বর্ধিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন নিতে হয়। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলো নিবন্ধনের সময় কোনো ক্ষেত্রে ১০ শয্যা, ২০ শয্যা, বা এর অধিক শয্যার জন্য অনুমোদন নিলেও পরবর্তীতে অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত শয্যা ব্যবহার করছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি হাসপাতাল/ ক্লিনিকের মধ্যে ৩৬টি প্রতিষ্ঠান শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করে; এর মধ্যে ২৩টি প্রতিষ্ঠান বর্ধিত শয্যার জন্য অনুমোদন গ্রহণ করে নি। এ প্রসঙ্গে একটি জেলার মালিক সমিতির সভাপতি জানান উক্ত এলাকায় অধিকাংশ ক্লিনিক ১০ শয্যার জন্য অনুমোদন নিলেও ১০ শয্যার হাসপাতাল দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো খরচ উঠাতে পারে না বিধায় অধিকাংশ ক্লিনিকই শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

৩.২.৭ নিবন্ধনের জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়

গবেষণায় নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। জানা যায়, এ অর্থ আদায়ের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা পর্যন্ত, এবং এটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, মালিক/ অংশীদারদের ওপর মহলে যোগাযোগ

[২৬] *পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা* ১৯৯৭, তফসিল-১।

ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অর্থ আদায়ের অভিযোগ সম্পর্কে জানালেও টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে নি। জানা যায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিভিল সার্জন অফিসের কর্মচারীদের (উচ্চমান সহকারী, অফিস সহকারী, পিয়ন) একাংশ এ অর্থ আদায় করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ অর্থ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত ভাগাভাগি হয়। এ প্রসঙ্গে একটি বিভাগীয় শহরের মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানান, "নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট হারে ঘুষ দিতে হয়।" সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঘুষ বাণিজ্যের তথ্য পাওয়া যায়।[২৭]

৩.৩ লাইসেন্স নবায়ন

নিবন্ধিত সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়ন করতে হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সে বলা আছে, লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ হতে একমাসের মধ্যে নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এক বিজ্ঞপ্তিতে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষদের অবহিত করা হয় যে, লাইসেন্স গ্রহণ/ নবায়ন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা সরকারি নীতিমালা-বহির্ভূত এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হালনাগাদ লাইসেন্স নবায়ন অত্যাবশ্যকীয়, এবং এতে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[২৮] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত **১১৬**টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **১৪**টি প্রতিষ্ঠান তাদের লাইসেন্স যথাসময়ে নবায়ন করে নি (হাসপাতাল/ক্লিনিক ৬টি এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র ৮টি), এবং এর মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে যথাসময়ে নবায়ন না করানোর প্রবণতা বেশি। দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো দুই থেকে ছয় বছরের জন্য একবার নবায়ন করিয়েছে। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান নবায়নের জন্য যথাসময়ে আবেদন করলেও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করে না।

সারণি ২: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স নবায়ন

গবেষণা এলাকা	মোট প্রতিষ্ঠান	লাইসেন্স নবায়ন আছে	লাইসেন্স নবায়ন করে নি
উপজেলা শহর	৩০	২৩	৭
জেলা শহর	৩২	৩২	-
বিভাগীয় শহর	২৮	২৩	৫
ঢাকা শহর	২৬	২৪	২
মোট	**১১৬**	**১০২**	**১৪**

৩.৩.২ শতভাগ শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও লাইসেন্স নবায়ন

প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু ক্ষেত্রে শতভাগ শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও নবায়ন প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি বিভাগীয় (স্বাস্থ্য) অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শিত ফরম্যাট অনুযায়ী শর্তের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ পূরণ করলে নবায়ন প্রদান করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয় তা হলো শয্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক জনবল না থাকা, যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল না থাকা, যথাযথ অবকাঠামো না থাকা, অনুমোদিত শয্যার অতিরিক্ত ব্যবহার, সেবার মূল্য টানানো না থাকা ইত্যাদি। উপজেলা পর্যায়ের একজন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তার মতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা সনদপ্রাপ্ত দক্ষ টেকনিশিয়ান না থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠানকে নবায়নের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

৩.৩.৩ পরিদর্শনের তারিখ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্ব থেকে অবহিতকরণ

নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স নবায়নের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শনের নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের নির্দেশনা দেওয়া না থাকলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিদর্শনের তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে অবহিত করা হয় বলে জানা যায়। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো ঐ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র এবং জনবল নিশ্চিত করে, কিন্তু পরবর্তীতে তা ঠিক রাখে না।

৩.৩.৪ লাইসেন্স নবায়নে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়

লাইসেন্স নবায়নে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, এ অর্থ আদায়ের পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত। তথ্যদাতাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের অর্থ আদায় সম্পর্কে জানালেও টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবায়নের সকল শর্ত পালনে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিয়ম-বহিভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন নবায়ন পাচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন না করেই নবায়ন দেওয়া হচ্ছে।

[২৭] *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ অক্টোবর ২০১৭। জানা যায়, বিভিন্ন অযোগ্যতার কারণে যেসব প্রতিষ্ঠানের আবেদন দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে ছিল সে ধরনের ৭৭টি প্রতিষ্ঠানের নামে লাইসেন্স জারি করা হয়। এই ৭৭টি লাইসেন্সে প্রায় ৮ কোটি টাকার ঘুষ আদায় হয়েছে।

[২৮] স্মারক নং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/প্রাঃ কিঃ/বিবিধ/১৫/১৩৩৩, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় প্রসঙ্গে জেলা পর্যায়ের একজন মালিক সমিতির সভাপতি জানান, "নবায়নের ক্ষেত্রে নিয়মিত মাসোহারা দিতে হয়, খামের বিনিময়ে সব পাশ হয়ে যায় এবং এমনকি আমার নিজের প্রতিষ্ঠান নবায়নের ক্ষেত্রেও পরিদর্শন দল পরিদর্শনে আসে নি।" এ প্রসঙ্গে একজন গণমাধ্যম কর্মী জানান সিভিল সার্জন বা বিভাগীয় পরিচালকের যখন অবসরে যাওয়ার সময় হয়, এর পূর্বে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শনের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং মোটা অংকের অর্থ আদায়ের মাধ্যমে নবায়ন দিয়ে থাকে। বিভাগীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবার নবায়নের ক্ষেত্রে কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়, তারা চুক্তির মাধ্যমে এই কাজ করে দেয়।

৩.৪ অবকাঠামো

অনেক ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র চিকিৎসাসেবার জন্য উপযোগী করে তৈরি ভবনে অবস্থিত হওয়ায় চিকিৎসাসেবার জন্য যথাযথ নয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২টি)। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট পরিসরে অসংখ্য ক্লিনিক, রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র ও চিকিৎসকের চেম্বার গড়ে উঠেছে, যার একটি বড় অংশ সরকারি হাসপাতালের আশেপাশে। সিভিল সার্জনের প্রতিবেদনেও উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত বিভিন্ন দুর্বলতা লক্ষ করা যায়।[২৯]

৩.৪.১ শয্যার জন্য বরাদ্দ স্থান

ভর্তিরত প্রতি সেবাগ্রহীতার জন্য মেঝের স্থান সুনির্দিষ্ট করা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ঘাটতি রয়েছে। যেমন, একটি কেবিনকে হার্ডবোর্ড দিয়ে দুটি কক্ষ, কোনো ক্ষেত্রে একটি ছোট্ট কক্ষের মধ্যে তিন থেকে চারটি শয্যা রাখা, আবার একটি আইসিইউ কক্ষে শয্যা রাখার কারণে চলাফেরার জন্য স্থানের পরিমাপ খুবই স্বল্প ছিল।

৩.৪.২ জরুরি বিভাগ

উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে জরুরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই (নির্বাচিত ৬৬টি হাসপাতাল/ক্লিনিকের মধ্যে ২১টি প্রতিষ্ঠানে)। কোনো দুর্ঘটনা বা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দিয়ে বিভাগীয় শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বা কোনো ক্ষেত্রে রোগী গ্রহণ করা হয় না।

৩.৪.৩ পোস্ট অপারেটিভ কক্ষ

অপারেশনের পর সেবাগ্রহীতাকে সাধারণ শয্যা অথবা কেবিনে নেওয়ার পূর্বে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের জন্য পোস্ট-অপারেটিভ কক্ষে রাখার প্রয়োজন হয়। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপারেশন ব্যবস্থা থাকলেও পোস্ট অপারেটিভ কক্ষের সুবিধা নেই। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি হাসপাতাল/ক্লিনিকে অপারেশনের ব্যবস্থা থাকলেও এর মধ্যে নয়টিতে পোস্ট অপারেটিভ কক্ষ নেই। আবার পোস্ট অপারেটিভ কক্ষ থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো সেবাগ্রহীতাদের জন্য ব্যবহার করা হয় না।

৩.৪.৪ প্যাথলজি ও নমুনা সংগ্রহ কক্ষ

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কিছু রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নমুনা সংগ্রহের জন্য পৃথক কক্ষ নেই, পরীক্ষাগার কক্ষেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্যাথলজিস্ট এর জন্য পৃথক কক্ষ নেই। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে পৃথক নমুনা সংগ্রহ কক্ষ নেই এবং প্যাথলজিস্টদের জন্য পৃথক কক্ষ নেই ২৬টি প্রতিষ্ঠানে। এ প্রসঙ্গে একটি দলীয় আলোচনায় সেবাগ্রহীতারা জানান, কয়েকটি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে প্রবেশের দরজা এত ছোট যে ঝুঁকে নিচু হয়ে ল্যাবে প্রবেশ করতে হয়। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিদর্শনের ফরম্যাটে পরীক্ষাগার কক্ষ, প্যাথলজি ও নমুনা সংগ্রহ কক্ষ পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৪.৫ এক্স-রে কক্ষ

সেবাপ্রদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারীর নিরাপত্তার স্বার্থে এক্স-রে কক্ষের দেয়ালের উচ্চতা যন্ত্রের আকারের ওপর নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং দরজায় লিড শীট ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়মগুলোর ব্যত্যয় ঘটে। এ প্রসঙ্গে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উপজেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনে এসে এক্স-রে কক্ষের দেয়াল আরও উঁচু করার জন্য এবং বিকিরণ কর্মীকে লিড অ্যাপ্রোন পরার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা যায়, এবং উপজেলা পর্যায়ের আরও দুটি প্রতিষ্ঠানে এক্স-রে কক্ষের

[২৯] সিভিল সার্জন কার্যালয়, স্বারক নং: পরিঃস্বাঃ/ময়মন বিভাগ/ক্লিনিক-প্যাথলজি-হাসপাতাল/৭/১৭৪/১(৭), ১৩ জুলাই ২০১৭।

দরজায় লিড শীট না থাকার তথ্য পাওয়া যায়।[৩০] এ প্রসঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানায় ঐ উপজেলায় টিনের ঘরে এক্স-রে করা হয় এমন প্রতিষ্ঠানও আছে।

চিত্র ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো

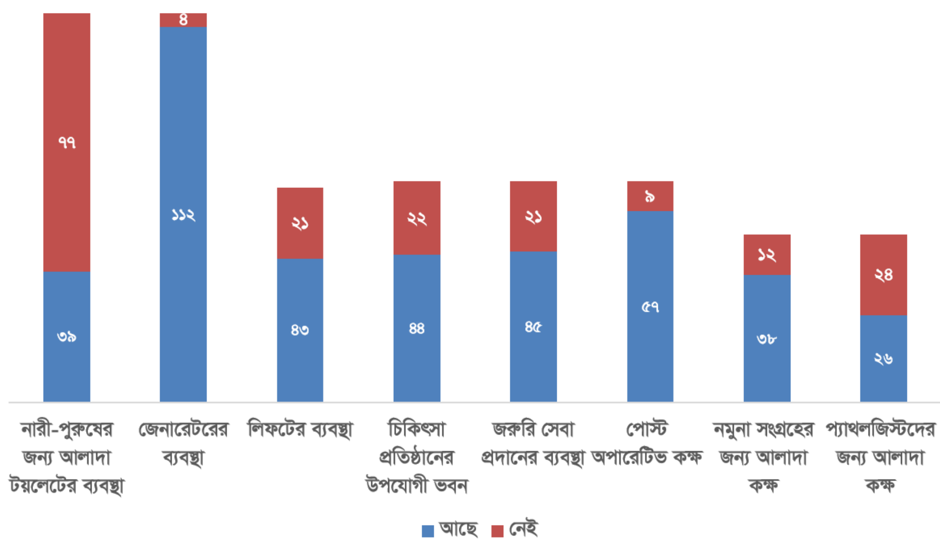

৩.৪.৬ চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণে অপেক্ষমান সেবাগ্রহীতা এবং অ্যাটেনডেন্টের জন্য পৃথক কক্ষ

আইন অনুযায়ী চিকিৎসক যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছে, চিকিৎসাসেবা গ্রহণে অপেক্ষমান সেবাগ্রহীতা এবং তাদের অ্যাটেনডেন্টের জন্য পৃথক কক্ষ থাকার কথা বলা হয়েছে।[৩১] গবেষণায় দেখা যায়, সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই চিকিৎসার জন্য অপেক্ষমান সেবাগ্রহীতা এবং তাদের অ্যাটেনডেন্টের জন্য পৃথক স্থান আছে। তবে কিছু প্রতিষ্ঠানে বিশেষত রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে যেখানে কনসালটেশন চেম্বার রয়েছে, সেখানে সেবাগ্রহীতাদের জন্য অপেক্ষমান স্থান পর্যাপ্ত নয়; সেবাগ্রহীতাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

৩.৪.৭ লিফট ও সিঁড়ি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ নার্সিং হোম এবং প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিদর্শন ফরম্যাটে তিনতলার অধিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে লিফট সুবিধা থাকার কথা বলা হয়েছে।[৩২] গবেষণায় দেখা যায়, কিছু প্রতিষ্ঠান তিনতলার অধিক হওয়া সত্ত্বেও লিফটের ব্যবস্থা নেই। নির্বাচিত **১১৬**টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৪টি প্রতিষ্ঠানে তিনতলার অধিক অকাঠামো আছে এবং এর মধ্যে **২১**টি প্রতিষ্ঠানের লিফটের ব্যবস্থা নেই। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের লিফট এবং সিঁড়ি স্ট্রেচার/ ট্রলি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের ওঠানামার জন্য যথাযথ/ নিরাপদ নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ির আস্তরণ খুলে টিন বের হয়ে যাওয়ার কারণে ওঠানামা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

৩.৪.৮ ট্রলি/ স্ট্রেচার/ হুইল চেয়ার

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেওয়ার জন্য ট্রলি/ স্ট্রেচার/ হুইল চেয়ার নেই। এ প্রসঙ্গে দলীয় আলোচনায় সেবাগ্রহীতাদের কেউ কেউ জানায়, সেবাগ্রহীতাকে ওটি থেকে কেবিনে (দোতালা বা তিনতলা) নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো স্ট্রেচার ছিল না, অন্যজনের সহায়তা হাঁটিয়ে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়।

৩.৪.৯ টয়লেট

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ নার্সিং হোম এবং প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিদর্শন ফরম্যাটে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৭৭টি প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে কেবিনে ভর্তিরত সেবাগ্রহীতার জন্য কোনো

[৩০] সিভিল সার্জন কার্যালয়, স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ১/১৬/৮২২৭, ১৪ নভেম্বর ২০১৬, এবং স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ১/১৬/৮২৩০, ১৪ নভেম্বর ২০১৬।

[৩১] *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স*, ১৯৮২, ধারা ৫।

[৩২] *প্রাগুক্ত*।

টয়লেট সুবিধা ছিল না, প্রতি তলায় ১০ থেকে ১২ জন রোগীর জন্য একটি বা দুটি করে টয়লেট ছিল। কিছু রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য একই টয়লেট ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভাগীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের নিচতলায় একটি টয়লেট থাকা সত্ত্বেও সেটি তালাবদ্ধ ছিল, যদিও সেখানে জরুরি বিভাগ এবং নমুনা সংগ্রহ কক্ষ ছিল। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানে প্যাথলজি কক্ষের পাশে কোনো টয়লেট সুবিধা না থাকায় কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়।[৩৩]

৩.৪.১০ জেনারেটর সুবিধা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ নার্সিং হোম এবং প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিদর্শন ফরম্যাটে জেনারেটরের সুবিধার উল্লেখ রয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নির্বাচিত উপজেলার একটি প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতাদের অবস্থান সত্ত্বেও বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর জেনারেটরের ব্যবস্থা ছিল না। গবেষণায় জরুরি এবং সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১১২টি প্রতিষ্ঠানে জেনারেটরের ব্যবস্থা ছিল, বাকি ৪টি প্রতিষ্ঠানে জেনারেটরের সুবিধা থাকলেও প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণের সময় তা সক্রিয় দেখা যায় নি।

৩.৪.১১ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি)

প্যাথলজিতে যন্ত্রপাতি ও রি-এজেন্ট সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সর্বদা এসি চালু থাকার প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কিছু ক্ষেত্রে এসি নেই আবার কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও তা সর্বদা ব্যবহার করা হচ্ছে না।

৩.৪.১২ পার্কিং ব্যবস্থা

অধিকাংশ বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের পার্কিং ব্যবস্থা অপ্রতুল। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলোর নিচে দোকান অথবা মার্কেট অবস্থিত, সেখানে পার্কিং এর কোনো ব্যবস্থা যেমন নেই, তেমনি আবার কিছু প্রতিষ্ঠানের গ্যারেজ এত ছোট যে সেখানে একটি অ্যাম্বুলেন্স বা গাড়ি রাখাও সম্ভব হয় না।

৩.৫ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

৩.৫.১ জরুরি বিভাগ

গবেষণায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবা প্রদানে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি রাখা হয় নি, যেমন অক্সিজেন, সাকার মেশিন, নেবুলাইজার, স্টেরিলাইজার, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপজেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানে জরুরি বিভাগে অক্সিজেন ও সাকার মেশিন ছিল না বিধায় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়।[৩৪]

৩.৫.২ অপারেশন থিয়েটার

আইন অনুযায়ী বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধনে সাতটি শর্তাবলীর উল্লেখ করা হয়; যারমধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটার এবং অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি (অপারেশন টেবিল, ওটি লাইট, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ইলেকট্রিক সাকার, অটোক্লেভ, স্টেরিলাইজার, ডায়াথারমি ও এনেসথেসিয়া মেশিন, রেফ্রিজারেটর, লেবার টেবিল ইত্যাদি) অন্যতম।[৩৫] পর্যবেক্ষণে উপজেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে এগুলোর অনুপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। যেমন, এনেসথেসিয়া মেশিন কার্যকর না থাকা, ডায়াথারমি মেশিন না থাকা এবং ডায়াথারমি মেশিন ঠিকভাবে কাজ না করা, স্পট লাইট না থাকা ইত্যাদি। সিভিল সার্জন কর্তৃক পরিদর্শনে অপারেশন থিয়েটারের ওটি লাইট সবগুলো কার্যকর না থাকা এবং স্পট লাইট না থাকার জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়।[৩৬]

৩.৫.৩ পোস্ট অপারেটিভ কক্ষ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী অপারেশনের পর সেবাগ্রহীতাকে পোস্ট অপারেটিভ কক্ষে রাখার ক্ষেত্রে যেসব ন্যূনতম যন্ত্রপাতি থাকার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো হলো, কার্ডিয়াক মনিটর, অক্সিজেন/ ভেন্টিলেশন সাপোর্ট ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা যায়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে পোস্ট অপারেটিভ কক্ষের সুবিধা থাকলেও এসব যন্ত্রপাতি রাখা হয় নি।

৩.৫.৪ প্যাথলজি ও নমুনা কক্ষ

- **ফ্রিজে থার্মোমিটার ব্যবহার:** কিছু কিছু রি-এজেন্ট সুনির্দিষ্ট (২ থেকে ৮ ডিগ্রি) তাপমাত্রায় রাখার নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, ওষুধের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্যাথলজি ফ্রিজ ব্যবহার না করে সাধারণ ফ্রিজ ব্যবহার করে। এতে

---

[৩৩] সিভিল সার্জন কার্যালয়, স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ১/১৬/৮২২৭, ১৪ নভেম্বর ২০১৬।

[৩৪] সিভিল সার্জন কার্যালয়, স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ০১/১৬/৮২২৪, ১৪ নভেম্বর ২০১৬।

[৩৫] *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স*, ১৯৮২, (ধারা ৯ এর সি ও ডি)।

[৩৬] সিভিল সার্জন কার্যালয়, স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ০১/১৬/৮২৩০, তারিখ: ১৪/১১/২০১৬ এবং স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ০১/১৬/৮২২৭, ১৪ নভেম্বর ২০১৬।

সঠিকভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না তা বোঝা যায় না। আবার সাধারণ ফ্রিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠান পৃথক থার্মোমিটার ব্যবহার করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফ্রিজের সাথে সংযুক্ত রেগুলেটরের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

- **পরীক্ষা কক্ষে থার্মোমিটার ব্যবহার:** সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতানুসারে, রি-এজেন্টের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে পরীক্ষাগার কক্ষটি ২৫ ডিগ্রী তাপমাত্রায় রাখতে হয় এবং থার্মোমিটার ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে উক্ত থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় না। এক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠানে এসি নেই বা সর্বদা এসি চালু রাখা হয় না অথবা কক্ষে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় না সেক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা বোঝা যায় না।

৩.৫.৫ নিডল ডেস্ট্রয়ার

আইন অনুযায়ী মেডিকেলে ব্যবহৃত ধারালো বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে, সকল প্রকার সুই, সকল প্রকার ব্লেড, ভাঙ্গা স্লাইড ইত্যাদি।[৩৭] এসব ধারালো বর্জ্য বিনষ্টকরণে প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথ ব্যবস্থা নেই। গবেষণায় দেখা যায়, জেলা ও উপজেলার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নিডল ডেস্ট্রয়ার যন্ত্রটি নেই। এ প্রসঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের একজন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা জানান উপজেলার শতকরা আশি ভাগ প্রতিষ্ঠানে নিডল ডেস্ট্রয়ার যন্ত্র নেই। উপজেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন কর্তৃক পরিদর্শনে একটি প্রতিষ্ঠানে উক্ত যন্ত্রটি ছিল না বিধায় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়।[৩৮] কিছু ক্ষেত্রে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হলেও ব্যবহার পরবর্তী সুঁইটি সাথে সাথে বিনষ্ট করা হয় না। অভিযোগ রয়েছে ব্যবহৃত সুঁই বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে একটি জেলা পর্যায়ের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত টেকনিশিয়ান জানান উক্ত জেলা ও উপজেলায় অনেক বেসরকারি ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র আছে যারা ব্যবহৃত সুঁইগুলো যন্ত্র দিয়ে সাথে সাথে বিনষ্ট না করে রাস্তার ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করে দেয়, এসব সিরিঞ্জ দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান হাসপাতালের আয়ারা ব্যবহৃত ইনজেকশনের সিরিঞ্জগুলো বিন থেকে নিয়ে বাইরে বাজারে বিক্রি করে দেয়। বিভাগীয় শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান, "ব্যবহৃত সিরিঞ্জগুলো নেওয়ার জন্য আমার প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন নেশাখোর এসেছিল।"

৩.৫.৬ এক্স-রে কক্ষের যন্ত্রপাতি

সেবাপ্রদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারীর নিরাপত্তার স্বার্থে এক্সে-রে কক্ষে সেবাপ্রদানকারীর জন্য লিড গ্লাস, লিড হ্যান্ড গ্লোভস, লিড অ্যাপ্রোন, লিড গগলস ইত্যাদি সামগ্রী রাখার নিয়ম রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়মগুলোর ব্যত্যয় ঘটে। তাছাড়া সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে এক্স-রে কক্ষের দরজায় লিড শিট না থাকার বিষয়টি জানা যায়।[৩৯]

একজন এক্স-রে কর্মীর নিজের নিরাপত্তার জন্য বিকিরণ তার শরীরে কতটুকু আসছে তা পরিমাপে থার্মো লুমিনেসেন্ট ডসিমিটার (টিএলডি) ব্যাজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যদিও টিএলডি ব্যাজ তাৎক্ষণিক কোনো সুরক্ষা দেয় না। বিকিরণের মাত্রা পরিমাপের জন্য একজন বিকিরণ কর্মীর জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীন পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পদার্থ বিভাগ হতে টিএলডি ব্যাজ গ্রহণ করতে হয়। বিকিরণ কর্মীর শরীরে বিকিরণ মাত্রা পরিমাপের জন্য তিনমাস পর পর টিএলডি ব্যাজ পরীক্ষা করাতে হয়। এক বছরে ২০ মিলিসিভাট এবং পাঁচ বছরে ১০০ মিলিসিভাট রেডিয়েশন নিতে পারে এবং এই মাত্রা অতিক্রম করে গেলে বিকিরণ কর্মীকে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মবিরতিতে যেতে হয়। তবে সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানায় গবেষণার সময় পর্যন্ত যতগুলো টিএলডি ব্যাজের ডোজ পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে ৫ মিলিসিভাট এর ওপরে কাউকে পাওয়া যায় নি।

৩.৬ জনবল ব্যবস্থাপনা

৩.৬.১ সার্বক্ষণিক চিকিৎসক

আইনের শর্ত মোতাবেক হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে প্রতি ১০ শয্যার জন্য ৩ জন চিকিৎসক রাখার কথা থাকলেও তা মেনে চলা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শর্তানুযায়ী ৫২টিতে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই। গড় বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধু ঢাকা মহানগরে গড় চিকিৎসকের সংখ্যা ৩.৫ জন। অন্যদিকে উপজেলা শহরে গড়ে ১.১ জন, জেলা শহরে গড়ে ১.৩ জন, এবং বিভাগীয় শহরে গড়ে (ঢাকা ব্যতীত) ২.৩ জন।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী চিকিৎসক নেই। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান অস্থায়ীভাবে একদল চিকিৎসকের সাথে চুক্তি করে অথবা একজন চিকিৎসকের সাথে প্রথমে যোগাযোগ করা হয়, যিনি প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগ

---

[৩৭] *চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা*, ২০০৮, ধারা ২।

[৩৮] সিভিল সার্জন কার্যালয়, স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ০১/১৬/৮২২৭, তারিখ, ১৪ নভেম্বর ২০১৬, স্মারক নং: সিএসএল/শা-প্রশা: ১/১৬/৮২৩০, ১৪ নভেম্বর ২০১৬।

[৩৯] *প্রাগুক্ত*।

করে শিফট অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্ব বণ্টন করেন। দেখা যায়, কেউ টানা দুই শিফটে, টানা তিন শিফটে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক টানা সাত থেকে আট দিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। আবার কোনো ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকই সার্বক্ষণিক চিকিৎসক হিসেবে তিন শিফটে কাজ করেন।

সারণি ৩: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল

এলাকা	সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই	সার্বক্ষণিক নার্স নেই	সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল ক্লিনিকের সংখ্যা
উপজেলা শহর	১৩	১৪	৭	১৪
জেলা শহর	১৩	১৬	৮	১৬
বিভাগীয় শহর	১১	৯	৬	১৪
ঢাকা মহানগর	১৫	১৪	৮	২২
মোট	**৫২**	**৫৩**	**২৯**	**৬৬**

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক না রেখে 'অন-কল' ভিত্তিক চিকিৎসক দিয়ে সেবা প্রদান করা হয়। অন-কল ভিত্তিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দিনের নির্দিষ্ট একটি সময়ে যে চিকিৎসককে পাওয়া যায় তাকেই সেবা প্রদানের জন্য ডেকে আনা হয়। বিভাগীয় শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান উক্ত বিভাগীয় শহরের ৭০ ভাগ ক্লিনিক বা হাসপাতালে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই এবং ৯০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা নার্স নেই। একটি জেলার সিভিল সার্জন অফিস হতে জানা যায় ঐ জেলায় ন্যূনতম একজন সার্বক্ষণিক চিকিৎসক আছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র তিনটি।

সার্বক্ষণিক চিকিৎসক প্রসঙ্গে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দু'জন চিকিৎসক জানান, "সার্বক্ষণিক চিকিৎসক হিসেবে তিন শিফটে কাজ করি এবং অর্ন্তবিভাগ, বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগেরও দায়িত্ব পালন করে থাকি, যে কারণে একটানা কাজ করায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ক্লান্তি অনুভব করি এবং সেবা প্রদানে অনীহা আসে।" এ প্রসঙ্গে একজন সিভিল সার্জন জানান, "একজন চিকিৎসক যখন ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করে, কাজের মান ঠিক থাকে না, নিয়ম হচ্ছে, তিন শিফটে তিনজন চিকিৎসক রাখতে হবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক লাভের জন্য একজন চিকিৎসক দ্বারাই তিন শিফটের কাজ করিয়ে থাকে। কিন্তু পরিদর্শনে এ বিষয়টি ধরা সম্ভব হয় না, কারণ, পরিদর্শনের সময় দায়িত্বরত যে চিকিৎসক থাকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এক শিফটেই কাজ করে বলে জানান।" আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসক না রেখে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (সকাল থেকে দুপুর) রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে একজন সিভিল সার্জন জানান এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসকের সকালের শিফটের সেট-আপ ঠিক রাখলেও বিকাল বেলার সেট-আপ ঠিক রাখা হয় না, কারণ সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন সকালের দিকে হয়ে থাকে।

৩.৬.২ সার্বক্ষণিক নার্স

আইনের শর্ত মোতাবেক হাসপাতাল/ ক্লিনিকগুলোতে প্রতি ১০ শয্যার জন্য তিন শিফটে ছয়জন ডিপ্লোমা নার্স রাখার কথা থাকলেও তা মেনে চলা হয় না। নির্বাচিত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৩টি প্রতিষ্ঠানে শয্যা অনুযায়ী সার্বক্ষণিক ডিপ্লোমা নার্স নেই। গড় বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধু বিভাগীয় শহর (ঢাকা ব্যতীত) ৬.২ জন এবং ঢাকা মহানগরে (৬.৪ জন) এই শর্ত পূরণ হলেও উপজেলা শহরে (গড়ে ১.১ জন) এবং জেলা শহরে (গড়ে ১.৫ জন) এটি অপ্রতুল।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নার্সের স্বল্পতা রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হেলথ বুলেটিন ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট নিবন্ধিত নার্স ৪৮,৯৩২ জন (এর মধ্যে সরকারি হাসপাতালের পদের সংখ্যা ২২,১৫৭ জন এবং পদায়ন আছে ১৬,৮৪০ জন)। অন্যদিকে নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মোট শয্যা সংখ্যা ৭৮,৪২৬টি। বিশ্লেষণে দেখা যায়, শয্যা অনুযায়ী শুধু বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের জন্যই নার্স প্রয়োজন ৪৭,০৫৬ জন, ঘাটতি ২০,২৮১ জনের।

বিশেষায়িত সেবা প্রদানেও নার্সের স্বল্পতা রয়েছে। বিশেষায়িত সেবার জন্য প্রশিক্ষিত নার্স রয়েছে ২১০ জন।[৪০] গবেষণায় নির্বাচিত দুটি প্রতিষ্ঠানেই শয্যা রয়েছে ১৮৬টি। বাংলাদেশে প্যাথলজিস্টের সংখ্যাও অপ্রতুল। এ প্রসঙ্গে একজন সিভিল সার্জন জানান চিকিৎসকরা প্যাথলজিতে পড়াশোনা করতে চায় না, কারণ এ বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করলে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়, কিন্তু একজন চিকিৎসক সার্জারী বা মেডিসিনে অভিজ্ঞ হলে তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় না যে কারণে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে প্যাথলজিস্ট তৈরি হয় নি।

[৪০] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *হেলথ বুলেটিন* ২০১৬।

ডিপ্লোমা ডিগ্রি নয় কিন্তু কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের দিয়ে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নার্সের কাজ করানো হয়।

বক্স ২: ডিপ্লোমা ডিগ্রিহীন নার্স

"আমার বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে একটি মেয়ে কাজ করতো। একদিন এক ক্লিনিকে গিয়ে দেখি সেখানে ঐ গৃহকর্মী নার্সের কাজ করছে। সে সেবাগ্রহীতাদের ইনজেকশন পুশ এবং আইভি ক্যানোলা দিচ্ছে।"

- উপজেলা পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

৩.৬.৩ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বেশিরভাগ রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে সনদবিহীন টেকনোলজিস্ট দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সহকারী টেকনিশিয়ান হিসেবে টেকনোলজিস্টদের অধীনে কয়েক বছর কাজ শেখে এবং পরবর্তীতে নিজেই কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে টেকনোলজিস্ট হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের একজন সরকারি মেডিকেল কর্মকর্তা (যিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেম্বার করছে) জানান উক্ত উপজেলায় মাত্র তিনটি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক টেকনোলজিস্ট রয়েছে, বাকিগুলোতে 'সহকারী টেকনিশিয়ান' দ্বারা কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহকারী টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করানো হলেও কাগজে-কলমে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কাজ করছে বলে দেখানো হয়। এ প্রসঙ্গে একজন সিভিল সার্জন জানান, "পরিদর্শনে গেলে টেকনোলজিস্ট পাওয়া যায় না, প্রতিষ্ঠান থেকে বলা হয়, ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্ট ছুটিতে আছে।" একটি জেলার দুইজন টেকনোলজিস্ট জানান ঐ জেলায় মোট ৪০টি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র আছে, যার মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ১২টি প্রতিষ্ঠানে সনদপ্রাপ্ত টেকনোলজিস্ট আছে, বাকিগুলোতে সনদবিহীন টেকনোলজিস্ট দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সনদপ্রাপ্ত টেকনোলজিস্টদের সাথে দুই থেকে তিন হাজার টাকার চুক্তি করা হয়, যেখানে টেকনোলজিস্ট হিসেবে কাজ না করলেও চুক্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে তাদের নাম ও সীল ব্যবহার করা হয়।

এক্স-রের কাজে সম্পৃক্ত সকলের রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং-এর ওপর ডিপ্লোমা করা নেই। তারা দেখে দেখে কাজ শিখেছে এবং এই অভিজ্ঞতা নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত একজন রেডিওগ্রাফার জানান তিনি সরকারি দায়িত্বের পর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এক্স-রের কাজ করেন। তিনি যখন সরকারি দায়িত্বে থাকেন, তখন উক্ত বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে কর্মরত সহকারী টেকনিশিয়ান এক্স-রের কাজটি করে থাকে যাকে তিনি নিজে কাজ শিখিয়েছিলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সময়ে অবেদনবিদ (অ্যানেসথেসিওলজিস্ট) পাওয়া যায় না। বিশেষ করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এই সমস্যাটি প্রকট। সাধারণত সরকারি হাসপাতালের অবেদনবিদেরাই বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কাজ করে থাকে। একজন অবেদনবিদ ঘুরে ঘুরে সবগুলো ক্লিনিকে কাজ করে। ফলে ক্লিনিকগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলেও অবেদনবিদের কারণে অস্ত্রোপচার শুরু করতে দেরি হয়। তাছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোতে নিজস্ব প্যাথলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট, এবং সনোলজিস্ট রাখা হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল দিয়ে নিয়ে আসা হয়।

৩.৬.৫ সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী

আইনের শর্ত মোতাবেক হাসপাতাল/ ক্লিনিকগুলোতে প্রতি ১০ শয্যার জন্য ৩ জন সুইপার রাখার কথা থাকলেও এই নিয়ম মেনে চলা হয় না। গবেষণায় নির্বাচিত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯টি প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই। এ প্রসঙ্গে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) থেকে জানা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতার কাজে 'আয়া', 'সুইপার', এবং 'ক্লিনার' যে নামেই কাজ করুক তাদেরকে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি জেলা পর্যায়ের একজন মালিক সমিতির সভাপতি জানায়, প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'সুইপার' অন-কল ভিত্তিক রাখা হয়, যারা সকালে একবেলা এসে কাজ করে দিয়ে চলে যায়। পর্যক্ষণে দেখা যায়, কিছু প্রতিষ্ঠানে শিশুদেরকে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করানো হচ্ছে।

৩.৭ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৩.৭.১ চিকিৎসা-বর্জ্যের পৃথকীকরণে ভিন্ন রঙ্গের বর্জ্য পাত্র ব্যবহার

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণ ও অপসারণ নিয়মটি সঠিকভাবে মানা হয় না। বিধিতে চিকিৎসাসেবা স্থলে বর্জ্যের ধরন অনুসারে সুনির্দিষ্ট রঙের বর্জ্যপাত্র[৪১] ব্যবহারের কথা বলা থাকলেও গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। নির্বাচিত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যূনতম চার ধরনের বর্জ্যপাত্র (কালো, লাল, হলুদ এবং নীল) ব্যবহার করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৮টি এবং ন্যূনতম তিন রঙের বর্জ্যপাত্র (কালো, লাল এবং হলুদ) ব্যবহার করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০টি। কিছু প্রতিষ্ঠানে পৃথক রঙ্গের বর্জ্যপাত্র রাখা হলেও সকল ইউনিটের ক্ষেত্রে তা রাখা হয় নি। এ প্রসঙ্গে সিভিল সার্জন

[৪১] *চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮।*

অফিস কর্তৃক তিনটি প্রতিষ্ঠানে অপারেশন থিয়েটারে বর্জ্যপাত্র না থাকায় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়।[৪২] একটি প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় অপারেশন কক্ষে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, সিরিঞ্জের প্যাকেট, ইনজেকশনের অ্যাম্পুল, এবং ব্যবহৃত ওষুধের প্যাকেট ওটিতেই পড়ে আছে এবং অস্ত্রোপচারের পরপর পরিষ্কার করা হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে সকল ধরনের বর্জ্য একই ধরনের পাত্রে রাখা হচ্ছে।

৩.৭.২ চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

ঢাকা মহানগরের মধ্যে অবস্থিত চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল বর্জ্য প্রিজম নামক একটি বেসরকারি সংস্থা অপসারণ করে। এক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরীর মধ্যে অবস্থিত ৪৮৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রিজমের সমঝোতা চুক্তি করা আছে।[৪৩] প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেডিক্যাল বর্জ্যের জন্য হাসপাতালের আকার অনুযায়ী প্রিজমকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক চার্জ দিতে হয়। একটি বিভাগীয় শহরের দুটি প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কাজ করলেও তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে করছে না। আরেকটি এলাকায় সেবা নামক একটি প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা বর্জ্য নিয়ে কাজ করছে।

তবে ঢাকা মহানগর ছাড়া অন্যান্য এলাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বর্জ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে না। সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে কাজটি করছে এবং এ বিষয়ে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রত্যয়নপত্র[৪৪] দেওয়া হচ্ছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা বর্জ্য অপসারণ যথযথভাবে করছে না, তেমনি কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা নিজেরাই চিকিৎসা বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে রাখে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের ল্যাব টেকনিশিয়ান জানান সব বর্জ্য একটি পাত্রে ফেলা রাখা হয় এবং পৌরসভা সব বর্জ্য একসাথে নিয়ে যায়। একটি বিভাগীয় শহরে দেখা যায় সিটি কর্পোরেশন চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের বর্জ্য একটি প্যাকেটের মধ্যে একসাথে খোলা ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছে - ট্রাকে করে একসাথে সকল ধরনের বর্জ্য নিয়ে যাওয়ার সময় প্যাকেটগুলো থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে রাস্তার ওপরে পড়ছে। উপজেলা পর্যায়ের আরেকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান তার এলাকায় বর্জ্যগুলো একজন সুইপার এসে নিয়ে যায়, তবে কোথায় ফেলে সে বিষয়ে তার ধারণা নেই। জেলা পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান, "আমাদের হাসাপাতালের দক্ষিণ পাশে জায়গা আছে। সারাদিনের বর্জ্য ওখানে রাখা হয়। পরবর্তীতে আমাদের বেতনভুক্ত একজন কর্মচারী সকল ধরনের বর্জ্য নিয়ে পৌরসভার নির্ধারিত স্থানে ফেলে দেয়।" পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে জানা যায়, সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন নিতে হলেও তারা এ অনুমোদন নেয় না।

৩.৭.৩ চিকিৎসা-বর্জ্যের প্রশিক্ষণ

বিধিমালায় চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা থাকলেও[৪৫] গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মচারীদের এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি জেলার সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল কর্মকর্তা জানান যারা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লিনিং এর কাজ করে তাদের বর্জ্যের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না, যে কারণে এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উত্তর দিতে পারে না, এমনকি প্রতিষ্ঠানের সিরিঞ্জ, সুঁইসহ অন্যান্য বর্জ্য বিনষ্টকরণের জন্য যে পৃথক যন্ত্র রয়েছে এ বিষয়েও তারা জানে না, যে কারণে বর্জ্য অপসারণ সঠিকভাবে হচ্ছে না।

৩.৭.৪ সংক্রমণ প্রতিরোধ

অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্তকরণের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যেমন অটোক্লেভ, ফিউমিগেশন, স্টেরিলাইজেশন ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলোর সকল প্রক্রিয়া মেনে চলে না। হাসপাতালকে সংক্রমণমুক্ত করার জন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ১৫ দিন, ৩০ দিন বা তিনমাস পরপর সংক্রমণমুক্ত করার জন্য ফিউমিগেশন করা হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। এ প্রসঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী একটি ফিউমিগেশন মেশিনের দাম প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এবং একবার ফেউমিগেশন করার জন্য যে ওষুধ প্রয়োজন হয় তার খরচ প্রায় ২,০০০ টাকা। ফলে সকল প্রতিষ্ঠান এই খরচ করতে চায় না এবং তারা এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় না। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ইনফেকশন প্রতিরোধ ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

---

[৪২] সিভিল সার্জন কার্যালয়, স্মারক নং: সিএসএল/প্রশা: ১/১৬/৮২২৭, ১৪ নভেম্বর ২০১৬; স্মারক নং: সিএসএল/প্রশা: ১/১৬/৮২২২, ১৪ নভেম্বর ২০১৬; স্মারক নং: সিএসএল/প্রশা: ১/১৬/৮২৩০, ১৪ নভেম্বর ২০১৬।

[৪৩] বিস্তারিত, http://pbf.org.bd/?page_id=717

[৪৪] পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের সাথে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তি করে থাকে এবং এটা নিজেরা করে। আর প্রতিষ্ঠানগুলো পৌরসভাকে এসব বর্জ্য অপসারণের জন্য খরচ দিয়ে থাকে। প্রত্যয়ন পত্রে বলা হয়েছে, "ব্যবসা/প্রতিষ্ঠানের কারণে কোনো প্রকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না বা আশেপাশে বসবাসরত জনগণের কোনো প্রকার সমস্যা হচ্ছে না যাহা সরেজমিনে তদন্তের প্রতীয়মান হয়েছে এবং এই প্রত্যয়নপত্রটি কোনো অবস্থাতেই পরিবেশগত ছাড়পত্র হিসেবে গণ্য হবে না।"

[৪৫] *চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৬ (১)।

অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্তকরণের জন্য অটোক্লেভ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্র সংক্রমণমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। তবে তিনটি প্রতিষ্ঠানে অটোক্লেভ যন্ত্রটি অকার্যকর ছিল এবং অকার্যকর অটোক্লেভ যন্ত্রটি চুলায় দিয়ে তাপ দেওয়া হচ্ছে বলে দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অটোক্লেভ পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। জেলা পর্যায়ের একটি হাসপাতালের ফিন্যান্স ও মার্কেটিং কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীরা সংক্রমণ প্রতিরোধক স্যাভ্লন ব্যবহার করে না এবং প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদিন ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয় না। তবে এটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের মালিকের ওপর।"

৩.৮ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ

আইন অনুযায়ী সেবাগ্রহীতার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশসহ যথোপযুক্ত নিবাসন ব্যবস্থা একটি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স প্রদান করার অন্যতম পূর্বশর্ত।[৪৬] তবে নিবন্ধনকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখলেও পরবর্তীতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি অব্যাহত থাকে না। গবেষণায় নির্বাচিত **১১৬টি** প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **৩২টি** প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ছিল না বলে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উদাহরণ হিসেবে ওয়ার্ড, কেবিনের মেঝে পরিষ্কার না থাকা, অপরিচ্ছন্ন চাদর, যত্রতত্র ময়লা, দুর্গন্ধ, প্যাথলজি কক্ষের ফ্রিজে রি-এজেন্টের সাথে খাবার রাখা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবিনের কক্ষগুলো আবদ্ধ, জানালার ব্যবস্থা না থাকা, এবং আলো বাতাসের অপর্যাপ্ততা, ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির ওপর ধুলাবালি, অপারেশন কক্ষের মধ্যে ব্যবহৃত বর্জ্য ফেলে রাখা, কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের প্রস্তুতি কক্ষ, হাত ধোয়ার বেসিন অপরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একটি প্রতিষ্ঠানের আইসিইউ কক্ষের মেঝে স্যাঁতস্যাতে ছিল। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের তথ্যানুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনে যেসব সমস্যা খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকা অন্যতম, এবং অস্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের জন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার জন্য নির্ধারিত টয়লেট পরিচ্ছন্ন ছিল না। যেমন, দুর্গন্ধ থাকা, টয়লেটে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য রাখা ইত্যাদি। নির্বাচিত **১১৬টি** প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **৪১টি** প্রতিষ্ঠানের টয়লেট পরিচ্ছন্ন ছিল না।

বক্স ৩: স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকা

"তিনদিন ভর্তি হওয়ার পর অদ্যাবধি বিছানার ছাদর পরিবর্তন করে দেয় নি, বাড়ি থেকে বিছানার চাদর আনিয়েছি।"
"অপারেশন পরবর্তী ভর্তি থাকাকালীন টয়লেটগুলো খুব অপরিষ্কার থাকায় টয়লেট ব্যবহার করতে পারতেন না, এ নিয়ে অভিযোগ করলে তাকে বলা হয় আপনার সমস্যা হলে তিনতলার টয়লেট ব্যবহার করুন। একজন আপরেশন রোগীর পক্ষে কিভাবে বারবার তিনতলায় যাওয়া সম্ভব।"

- উপজেলা পর্যায়ে একটি দলীয় আলোচনায় উপস্থিত সেবাগ্রহীতারা

"ওয়ার্ডে তেলাপোকা ছিল। হাসপাতাল থেকে স্প্রে করা হলেও তেলাপোকা কমে নি। ছয় থেকে সাতটি শয্যার সেবাগ্রহীতার জন্য একটিমাত্র টয়লেট ছিল যা দিনে একবার পরিষ্কার করা হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। চিকিৎসকরা যখন ভিজিটে আসত তখন তাৎক্ষনিকভাবে স্টাফরা হাসপাতাল বা ওয়ার্ড পরিষ্কার করলেও অন্যান্য সময় তা অপরিচ্ছন্ন থাকতো।"

- ঢাকা মহানগরে একটি দলীয় আলোচনায় একজন সেবাগ্রহীতা

৩.৯ বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় বিপণন ব্যবস্থা

বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কমিশন-ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিপণন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়, যেখানে বিপণন কর্মকর্তার কাজ হলো পার্শ্ববর্তী এলাকা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সুবিধা সম্পর্কে মৌখিকভাবে অথবা লিফলেটের মাধ্যমে অবহিতকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রোগী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা। উল্লেখ্য, রোগী পাঠানোর বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে কমিশন প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন বিপণন কর্মকর্তা জানান বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান সেবার মানসিকতা থেকে সরে ব্যবসায়িক মানসিকতা নিয়ে চলছে। বর্তমান বাজার অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক, তাই একজন বিপণন কর্মকর্তা প্রতিটি উপজেলাতে ভিজিট করে, দিনে ২০ থেকে ২৫ জন পল্লী চিকিৎসককে ভিজিট করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিপণন কর্মকর্তার জন্য পৃথক এলাকা ভাগ করে দেওয়া হয়। একটি জেলার সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান অনেক হাসপাতাল গুণগত সেবা প্রদান করে না, যেহেতু পল্লী চিকিৎসক বা চিকিৎসকদের কমিশন দেওয়া হয় সেহেতু তাদের সেবাগ্রহীতার কোনো অভাব হয় না। কমিশন ছাড়াও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলো বিশেষজ্ঞ চিকিৎকদের আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে, যাতে তারা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য

---

[৪৬] *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স*, **১৯৮২**, ধারা ৯।

রোগী পাঠায়। যেমন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎকদের জন্য বিনামূল্যে কনসালটেশন চেম্বারের ব্যবস্থা করে দেয় এবং ঐ চিকিৎসকদের জন্য একজন বা দুইজন সহকারী দেওয়া হয় যারা রোগীদের সিরিয়াল দেওয়ার কাজ করে থাকে এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে থাকে। এই সহকারীর বেতনও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র বা ক্লিনিক বহন করে থাকে।

৩.৯.১ কমিশনের সাথে জড়িত ব্যক্তি

বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশন-ভিত্তিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক, স্বাস্থ্য সহকারি, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, পল্লী চিকিৎসক, ফার্মেসীর ওষুধ বিক্রেতা, ধাত্রী, বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের রিসিপশনিস্ট, রিক্সাওয়ালা, এবং পেশাদার দালাল।

৩.৯.২ কমিশনভোগীদের সম্পৃক্ততার ধরন

- **সরকারি চিকিৎসক:** সেবাগ্রহীতাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজে থেকে আবার সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে বেসরকারি হাসপাতাল হতে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। সরকারি চিকিৎসক যিনি যে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, সেবাগ্রহীতাকে সেখানেই যাওয়ার পরামর্শ দেয় বা বাধ্য করে। আবার চিকিৎসকরা সুনির্দিষ্ট বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের প্রেসক্রাইবড ফরমে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলো চিহ্নিত করে দেয় এবং ঐ কেন্দ্র হতে পরীক্ষা করানোর জন্য পরামর্শ দেয়। যদিও চিকিৎসকদের কোড অব প্রফেশনাল কনডাক্ট-এ বলা আছে, একজন চিকিৎসক আর্থিক সুবিধা লাভে কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা এবং চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণে রেফারেলের জন্য প্রস্তাব দিতে পারবে না।

বক্স ৪: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার পরামর্শ

"সরকারি হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য গেলে দালাল বলে এখানে চিকিৎসা নিতে গেলে আপনার সিরিয়াল পেতে একমাস সময় লাগবে, যদি ক্লিনিকে যান তাহলে সাথে সাথে সিজার করাতে পারবেন। এই বলে তার সাথে ১২ হাজার টাকার চুক্তি করে ক্লিনিকে নিয়ে যায়। যদিও তিনি পরবর্তীতে জানতে পারে দালাল হাসপাতালে ৭ হাজার টাকা জমা দেয়।"

- উপজেলা পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় একজন সেবাগ্রহীতা

চিকিৎসকদের কমিশন প্রসঙ্গে উপজেলা পর্যায়ে একটি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের মালিক জানান, "যদি চিকিৎসককে কমিশন দেওয়া না হয়, তবে আগামীকাল থেকে আমার প্রতিষ্ঠান হবে এ এলাকার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ প্রতিষ্ঠান।" এ প্রসঙ্গে সেবাগ্রহীতারা জানায় চিকিৎসক ভিজিটিং কার্ড দিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠায়, কখনো ভিজিটিং কার্ডের বিপরীতে চিকিৎসকের সহকারী যিনি সিরিয়াল নিয়ন্ত্রণ করে (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে) তার নাম এবং ফোন নম্বর লিখে দেয়।

বক্স ৫: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া

"বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কাজ করে থাকি। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসকের (যিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেম্বার করে থাকেন) কক্ষের সামনে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কাজ করি। চিকিৎসক যদি সেবাগ্রহীতাকে ডিজিটাল এক্স-রে দেয়, সেবাগ্রহীতাকে সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাই। তাছাড়া উক্ত চিকিৎসক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেম্বার করে এবং সিজারও করে থাকে।"

- উপজেলা পর্যায়ের বিপণন প্রতিনিধি

- **সরকারি হাসপাতালের কর্মচারী:** সরকারি হাসপাতালের নার্স ও কর্মচারীদের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ এবং অলিখিত চুক্তি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা সরকারি হাসপাতালে গেলে অনেক ক্ষেত্রে কর্মচারীরা বা দালাল নামধারী ব্যক্তি বিভিন্ন কৌশলে (সরকারি হাসপাতাল হতে রোগ-নির্ণয় প্রতিবেদন পেতে অনেক সময় লাগবে, এখানকার প্রতিবেদন ভালো হয় না, মেশিন নষ্ট, টেকনোলজিস্ট নেই ইত্যাদি) রোগীকে চিকিৎসকের সুনির্দিষ্ট চেম্বার বা সুনির্দিষ্ট রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে পাঠিয়ে থাকে। কোনো ক্ষেত্রে নিজেরাই নিয়ে যায় অথবা কোনো ক্ষেত্রে ফোন করে সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়।

সরকারি হাসপাতালের অফিস চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুপস্থিত থাকা এবং সেবাগ্রহীতাদের নির্দিষ্ট রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে যেতে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। সেবাগ্রহীতাদের কেউ কেউ সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য গেলে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন পায় না, আবার কখনো সংশ্লিষ্ট ইউনিটটি বন্ধ থাকারও অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে সেবাগ্রহীতারা বাধ্য হয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনে না পাওয়া সরকারি কর্মচারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সন্নিকটে বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে অন-কলে চাকরি করে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের একজন সেবাগ্রহীতা জানায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গেলে কর্মরত কর্মচারীকে পাওয়া যায় না, কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলে, তিনি পান খেতে অথবা নাস্তা করতে

অথবা একটু বাইরে গেছে। উপজেলা পর্যায়ের আরেকজন সেবাগ্রহীতা জানায়, "একদিন সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এবং পরপর দু'দিন সরকারি হাসপাতালে এক্স-রে করার জন্য অপেক্ষা করেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নি"।

সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্তৃক সেবাগ্রহীতাকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বেসরকারিতে পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপজেলার সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক (ইপিআই) জানান তিনি ইপিআই প্রোগ্রামে কাজ করছেন। যখন রোগীরা টিকা নিতে কেন্দ্রে আসে, তাদের সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে নিয়ে যাওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে উপজেলার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানায়, "এফডাব্লিউভিরা যদি কোনো ক্লিনিক বা হাসপাতালে রোগী নিয়ে যায় তাহলে ২,০০০-৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করে, আবার সেবাগ্রহীতার কাছ থেকেও তারা আলাদাভাবে টাকা নেয়। যদি তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা দেওয়া না হয় তবে তারা সে প্রতিষ্ঠানেরা নামে নানা ধরনের অপপ্রচার চালায়"।

- **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের রিসিপশনিস্ট:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রিসিপশনিস্ট কর্তৃক সেবাগ্রহীতাকে অন্য প্রতিষ্ঠানে পাঠানো এবং কমিশন নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। যেমন, কেউ যদি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে যেয়ে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসককে না পায়, সেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রিসিপশনিস্ট তাকে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে চেম্বার করা চিকিৎসকের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে পাঠায় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ফোনের মাধ্যমে অবহিত করে যে তিনি একজন রোগী পাঠিয়েছে এবং এক্ষেত্রে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন পেয়ে থাকে।

- **পল্লী চিকিৎসক/ওষুধ বিক্রেতা:** পল্লী চিকিৎসক এবং ওষুধ বিক্রেতাও বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র বা ক্লিনিকগুলোতে রোগী পাঠিয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে তারাও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কমিশন পেয়ে থাকে।

- **পেশাদার দালাল:** সরকারি হাসপাতালে দায়িত্বরত চিকিৎসকের (যিনি বেসরকারিতে চেম্বার করে থাকে) কক্ষের সামনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে নিয়োগ দেওয়া কর্মচারীরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে এবং চিকিৎসক কোনো পরীক্ষা দিলে তাকে সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান। সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবার কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসক কর্তৃক সিজার করানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে একজন দালাল জানায় "এলাকায় অনেক সংখ্যক রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র হওয়াতে প্রতিষ্ঠান থেকেই দালাল ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে"। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের প্রতিনিধি এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের অ্যাম্বুলেন্স সরকারি হাসপাতালের সামনে অবস্থান করে। তারা সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং কর্মচারীর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সেবা গ্রহণে বাধ্য করছে।

৩.৯.৩ কমিশনের পরিমাণ

বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর সাথে অলিখিত কমিশন চুক্তি হয়ে থাকে। কমিশনের পরিমাণ নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে বোঝাপড়ার ওপর। কমিশনের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১৫% থেকে সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত। কিছু ক্ষেত্রে সিজারিয়ান রোগী পাঠালেও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কমিশন দেওয়া হয়। জানা যায়, এ কমিশনের পরিমাণ রোগী প্রতি ৫০০-৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। একটি বিভাগীয় শহরে প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স সমিতির সভাপতির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রোগ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মোট পরীক্ষা মূল্যের ৩৫% খরচ প্যাথলজিস্ট ফি, ২০% রি-এজেন্ট, ৫% কর্মচারীদের বেতন, ১০% মালিকের মুনাফা এবং ৩০% কমিশন খরচ।

৩.৯.৪ দালাল কর্তৃক হয়রানি

সেবাগ্রহীতাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশাদার দালাল কর্তৃক হয়রানি হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দালাল হিসেবে যারা কাজ করে তাদের চিকিৎসক সম্পর্কে এবং কোন রোগের জন্য কোন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকে না। দালালদের মানসিকতাই হলো দালালির মাধ্যমে টাকা আদায়। তাই তারা সেবা নিতে আসা ব্যক্তিদের বিভিন্ন কৌশলে ভুল তথ্য দিয়ে অখ্যাত প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, এ ধরনের ঘটনা বিশেষ করে গ্রাম থেকে আসা অসচেতন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। বিভাগীয় পর্যায়ের একটি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জানায় উক্ত এলাকার স্থানীয় মানুষের মূল ব্যবসা হলো দালালি এবং ক্লিনিকগুলোর ৭০ ভাগ রোগী আসে দালালের মাধ্যমে।

বক্স ৬: দালাল কর্তৃক হয়রানি

"আমার গ্রামের পরিচিতি একজন ব্যক্তি চিকিৎসক দেখাতে আসলে দালালের খপ্পরে পড়ে এবং ৯ হাজার টাকা গচ্চা দেয়। সে এসেছিল আমার কাছে, কিন্তু দালাল তাকে অখ্যাত একটি ক্লিনিকে নিয়ে যায় এবং কিছু ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে টাকা রেখে দেয়। পরে সে খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে আসে।"

- বিভাগীয় পর্যায়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক

৩.১০ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা হতে দেখা যায়, বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো চিকিৎসাসেবার জন্য যথাযথ নয়। শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের (চিকিৎসক, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, পরিচ্ছন্নতা কর্মী) ঘাটতি বিদ্যমান। এই ঘাটতি অস্থায়ী জনবল দিয়ে পূরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি, যথাযথ প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না হওয়া এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ঘাটতিও বিদ্যমান। এই খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে কমিশন-ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

অধ্যায় চার

চিকিৎসাসেবা

৪.১ ভূমিকা

বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো জেনারেল মেডিসিন, প্রসূতি সেবা, জেনারেল সার্জারী, রোগ-নির্ণয় প্রভৃতি ধরনের সেবা প্রদান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষায়িত সেবাও দেয়। দেশব্যাপী বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি ঘটলেও সেবাগ্রহীতারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে এসে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়। চিকিৎসাসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো।

৪.২ চিকিৎসক প্রদত্ত সেবা

৪.২.১ সার্বক্ষণিক চিকিৎসক

চিকিৎসা গ্রহণের সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সার্বক্ষণিক চিকিৎসক সেবা পায় নি, বিশেষকরে রাতের বেলায় জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসক সেবা পাওয়া যায় নি। সাধারণত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁদের সরকারি দায়িত্ব পালনের পরবর্তী সময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে। ফলে এর বাইরে অন্য সময়ে রোগীর প্রয়োজনে সেবাগ্রহীতারা চিকিৎসকদের সেবা পায় না।

বক্স ৭: সার্বক্ষণিক চিকিৎসক না থাকা

"রাত প্রায় একটার দিকে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে একটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে গেলে সেখানে কোনো চিকিৎসক পাই নি। প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তি হওয়ার জন্য বলে এবং জানায়, সাধারণ ওয়ার্ড বা কোনো কেবিন খালি নেই, ভিআইপি কেবিনে নিতে হবে। পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে ভিআইপি কেবিনে ভর্তি হই। প্রতিষ্ঠানের কোনো চিকিৎসক না দেখিয়েই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।"

- ঢাকা মহানগরে দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

"সিজার পরবর্তী সময়ে উক্ত চিকিৎসক অথবা প্রতিষ্ঠানের অন্য কোনো চিকিৎসক দেখতে আসে নি। হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই সেলাইয়ে ঘা হয়ে তীব্র ব্যথা অনুভূত হলে নার্সকে চিকিৎসককে ডাকার জন্য বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের নার্স জানায়, চিকিৎসক অন্য জেলায় প্রশিক্ষণে গিয়েছে, আসতে কয়েকদিন দেরি হবে। উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার এবং নার্স চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকে। পাঁচদিন পর চিকিৎসক এসে সেবাগ্রহীতার সংক্রমিত স্থানের কিছু অংশ কেটে নতুন করে সেলাই করে দেয়। আমাকে জানানো হয়, আরও দশদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। অতিরিক্ত দশদিনের খরচও আমাকে বহন করতে হয়।"

- জেলা পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

৪.২.২ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রদত্ত সেবা

আইন অনুযায়ী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক অপারেশন, চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার[৪৭] কথা বলা হলেও উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অস্ত্রোপচার পরবর্তী জটিলতা বা ফলো-আপের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া যায় না বলে গবেষণায় দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উপজেলার একটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার জানান, "উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন চিকিৎসক অন-কলে সিজার করে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ফলো-আপ করতে আসে না।" এক্ষেত্রে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের অনেক ক্ষেত্রে সিজার পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ফলো-আপ করে থাকে (যেসব প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক আছে) এবং সেবাগ্রহীতার জরুরি প্রয়োজনে যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে ফোনের মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। যদি সেবাগ্রহীতার বেশি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে অন্য শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবার উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সপ্তাহের ১-২ দিন উক্ত এলাকার বাইরে থেকে এসে পরামর্শ দেয়, ফলে সেবাগ্রহীতার অন্য সময়ে জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসক পাওয়া যায় নি।

৪.৩ নার্স প্রদত্ত সেবা

বেসরকারি চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে নার্সদের দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নার্সদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী নয়, তবে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। চিকিৎসকের সহকারী হিসেবে তারা অপারেশন কার্যক্রমে সহায়তা করে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপারেশন পরবর্তী সেলাই, কাটা-ছেঁড়ার সেলাই, সার্জারির পর ফলো-আপ ইত্যাদি কাজগুলো

[৪৭] *দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২*, ধারা ৯ (ছ)।

করে। এ প্রসঙ্গে একজন সহকারী নার্স জানান, "কয়েকদিন আগে একজনের মাথায় ফ্যান পড়ে কপাল ফেটে গেলে সেলাই করি, সেলাই খুলে দেই ও ওষুধের বিষয়েও পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের চার বছর ধরে এ কাজগুলো করছি।" উপজেলা পর্যায়ের কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মী জানান উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা নার্স হিসেবে চিকিৎসাসেবা প্রদান করছে, তাদের অনেকের সনদ নেই, আবার যাদের সনদ আছে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই, যে কারণে তারা দক্ষতার সাথে ইনজেকশন পুশ করা, আইভি ক্যানুলা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালোভাবে করতে পারে না।

উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আয়া দিয়ে নার্সের কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে, যেমন সহকারী নার্স অথবা প্রতিষ্ঠানের আয়া কর্তৃক ইসিজি পরিচালনা। এ প্রসঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠানের সহকারী ল্যাব টেকনিশিয়ান জানান, "ইসিজি যে কেউ করতে পারবে, কোনো নারী রোগী আসলে সহকারী নার্স বা আয়া ইসিজি করে থাকে", যদিও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মতে ইসিজি অবশ্যই ডিপ্লোমা নার্স দিয়ে করতে হবে। জেলা পর্যায়ের নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি জানান, "বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতে নার্স নেই, আয়া দিয়ে কাজ করানো হয়। যারা নার্স হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করছে তাদের নার্সের অ্যাপ্রন পরিয়ে রাখা হলেও তারা আসলেই নার্স কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার জরুরি প্রয়োজনে নার্সকে ডাকার পরও পাওয়া যায় নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার সাথে দুর্ব্যবহার করে বা বিরক্তি প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে যে অভিযোগগুলো আসে সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নার্স কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও তাদের আচরণ সম্পর্কিত।

বক্স ৮: নার্স ও আয়াদের আচরণ

"কেবিনের টয়লেটটি খুব নোংরা থাকায় নার্স বা আয়াদের জানালে তারা বলে এখানে থাকতে হলে এভাবেই থাকতে হবে।"

"হাসপাতাল এবং টয়লেটের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে অভিযোগ করলে নার্স এবং আয়ারা বলে, 'এখানে এতো রোগী থাকে তাদের কারও কোনো সমস্যা হয় না, শুধু আপনার সমস্যা হয়; আপনার যদি বেশি সমস্যা হয়, আপনি তিনতলার টয়লেট ব্যবহার করুন'।"

"কোনো প্রয়োজনে নার্সদের ডাকা হলে তারা আসে না কিন্তু কোনো জরুরি কাজ করছে না বসে পান খাচ্ছে এবং আড্ডা দিচ্ছে।"

- উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা

৪.৪ আয়া/ ওয়ার্ডবয় প্রদত্ত সেবা

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াদের কাছ থেকে সেবাগ্রহীতারা ভালো ব্যবহারও পায় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। কোনো প্রয়োজনে তাদের ডাকা হলে দুর্ব্যবহার বা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে।

৪.৫ রোগ-নির্ণয়

৪.৫.১ চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চিকিৎসক কর্তৃক সেবাগ্রহীতাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, প্রয়োজন হোক বা না হোক প্রতিজন রোগীকে কিছু না কিছু পরীক্ষা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বিভাগীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, "যেখানে ৫০০ টাকার পরীক্ষার প্রয়োজন, দেওয়া হচ্ছে ১,০০০ টাকার পরীক্ষা।" একটি জেলার নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির মতে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বসার জন্য চেম্বারের ব্যবস্থা করে দেয় এবং এক্ষেত্রে চিকিৎসক আর মালিকের মধ্যে চুক্তি থাকে বিধায় যে কোনো চিকিৎসকের কাছে যে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে একটা না একটা পরীক্ষা দেবেই।

বক্স ৯: চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

"আমি আমার আত্মীয়কে গ্রামের একজন পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একজন চিকিৎকের (যিনি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক) কাছে নিয়ে যাই। রোগীর জ্বর এবং অ্যাজমা ছিল। তিনি সেবাগ্রহীতাকে ৪,০০০ টাকার পরীক্ষা (এক্স-রে, সিবিসি, ও হরমোন পরীক্ষা) দেন। এত টাকার পরীক্ষা দেখে তাকে অন্য একজনের পরামর্শে একজন মেডিসিন কনসালটেন্টের (যিনি সদর হাসপাতালের চিকিৎসক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চর্চা করছেন) কাছে নিয়ে যাই এবং তিনি ৮০০ টাকার পরীক্ষা (এক্স-রে এবং সিবিসি) দেন। উক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ।"

"প্রসব পূর্ব সেবা নিতে গেলে চিকিৎসক অনেকগুলো পরীক্ষার সাথে এক্স-রে দেয়। কিন্তু যখন বলা হয়, একজন প্রসূতির এক্স-রে করা ঠিক হবে কি না, তখন তারা বলে ভুল করে লিখেছে, বাদ দিয়ে দিচ্ছি।"

- জেলা পর্যায়ের দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা

"অসুস্থতার কারণে হাসপাতালের জরুরিতে গেলে তারা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেয়। সেইদিনই রাত চারটার দিকে

আবারও শরীর খারাপ করলে হাসপাতালে গেলে তারা ভর্তি করিয়ে নেয়। ভর্তি থাকা অবস্থায় তারা বেশ কিছু পরীক্ষা করায়। পরবর্তীতে হাসপাতাল থেকে ফিরলে দেখি পরীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আমার ইউটেরাস ঠিক আছে। কিন্তু আমার ইউটেরাস ২০০৩ সালে থাইল্যান্ডে অপারেশন করে ফেলে দিয়েছি।"

- বিভাগীয় পর্যায়ের দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

৪.৫.২ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রি-এজেন্ট ব্যবহার

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নমানের রি-এজেন্ট এবং মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। নিম্নমানের রি-এজেন্ট ব্যবহার করলে পরীক্ষার প্রতিবেদন সঠিক হয় না বলে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানা যায়। মুনাফার লোভে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের নিম্নমানের রি-এজেন্ট ব্যবহার করছে বলে গবেষণায় জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বিভাগীয় শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান, "আমরা যে রি-এজেন্ট ব্যবহার করি সেগুলো ১০ হাজার টাকায় কিনলেও অনেক প্রতিষ্ঠান একই রি-এজেন্ট ৩ হাজার টাকায় কিনছে এবং রি-এজেন্টের মানের তারতম্যের কারণে পরীক্ষার প্রতিবেদনে তারতম্য হয়"। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান উক্ত জেলার মাত্র ১০ ভাগ প্রতিষ্ঠান ভালো মানের রি-এজেন্ট ব্যবহার করছে। জেলা পর্যায়ের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত টেকনিশিয়ান জানান, "যেসব রি-এজেন্টের মেয়াদ শেষ, সেগুলোর মেয়াদের তারিখের তারিখ উঠিয়ে নতুন তারিখ বসানো হয়। এক্ষেত্রে কিছু অসাধু রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সম্পৃক্ত"। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে জানা যায় ২০১৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর পরিচালিত অভিযানে ২০১১ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া রি-এজেন্ট দিয়ে পরীক্ষা করানো হচ্ছে বলে দেখা যায়। আরেকজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান তিনি একটি জেলায় ছয়টি (তিনদিনের মধ্যে) প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়েছেন এবং সবগুলোতেই মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট পেয়েছেন এবং এর জন্যে জরিমানাও করা হয়েছে। গবেষণা চলাকালীন উপজেলা পর্যায়ের একটি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের সময় দেখা যায় একটি রি-এজেন্টের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ডিসেম্বর ২০১৬ লেখা থাকলেও ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে উক্ত রি-এজেন্টটি ঐ প্রতিষ্ঠানের ফ্রিজে সংরক্ষণ করা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের টেকনিশিয়ান জানান যে এর কিছু ব্যবহার করা হয়েছে,বাকিটুকু ফেলে দেওয়া হবে।

বক্স ১০: ভুল রোগ-নির্ণয় প্রতিবেদন

"আমার এক আত্মীয়ের পেটে ব্যথা ছিল, তাকে একটি ক্লিনিকে দেখানোর পর পরীক্ষার প্রতিবেদনে বলা হয় পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি জেলা থেকে পরীক্ষা করানো হয় এবং তাতে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা বলা হয়। যখন দুই জায়গায় দুই রকম প্রতিবেদন আসে তখন তাকে অন্য একটি জেলা হতে পরীক্ষা করালে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে তাকে উক্ত এলাকা হতে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অপারেশন করানো হয়।"

- উপজেলা পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

"একটি ক্লিনিক থেকে পরীক্ষা করালে প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায় আমি মা হতে পারবো না এবং তারা আমাকে সান্তনা দেয়, দুঃখ করবেন না, সবাইতো আর মা হতে পারে না। পরবর্তীতে বিভাগীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করালে জানা যায় পূর্বের প্রতিবেদনটি সঠিক ছিল না এবং বর্তমানে আমার একটি সন্তান আছে।"

- জেলা পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

"মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানায়, হাতের পাঁচটি আঙুলই কেটে ফেলতে হবে। পরবর্তীতে ঢাকায় এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ঢাকার পিজি হাসপাতালে গেলে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয় এবং ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয়। বর্তমানে রোগী সুস্থ আছে।"

- বিভাগীয় পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

৪.৫.৩ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন তৈরি

বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহের পর টেকনোলজিস্ট নমুনা প্রক্রিয়া করবেন, যন্ত্রপাতি পরিচালনা করবেন এবং বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগের ব্যাখ্যা করবেন এবং প্রতিবেদন তৈরি করে সেখানে স্বাক্ষর করবেন। গবেষণায় দেখা যায়, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সাদা প্যাডে পূর্ব থেকে বিশেষজ্ঞের স্বাক্ষর করে রাখা হয় এবং টেকনিশিয়ান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উক্ত প্যাডে প্রতিবেদন তৈরি করে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক যখন প্রতিষ্ঠানে থাকে না, ম্যানেজার বা টেকনিশিয়ান চিকিৎসকের নামে তখন স্বাক্ষর করে। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক অনেক ক্ষেত্রে জানেন না। যদিও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক চিকিৎসকদের পেশাগত আচরণ ও নীতিতে চিকিৎসক কর্তৃক সঠিকভাবে যাচাই ব্যতীত মেডিকেল প্রতিবেদন, অসুস্থতার সনদপত্র ও অন্যান্য মেডিকেল দলিল ও প্রমাণপত্র প্রদান এবং কোনো অবস্থায় সাদা প্যাডে স্বাক্ষর নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৪৮] আবার কোনো কোনো

[৪৮] বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, Code of Professional Conduct, Etiquette and Ethics, 5.3; http://bmdc.org.bd/etiquette-and-ethics/ (২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা না করেই প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, এ ধরনের টেস্টকে 'বালতি টেস্ট' বলা হয়। এ প্রসঙ্গে বিভাগীয় শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান উক্ত শহরে শতকার ৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

৪.৫.৪ রোগ-নির্ণয় প্রতিবেদনের যথার্থতা

প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু ক্ষেত্রে রোগ-নির্ণয় সঠিক হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা দীর্ঘদিন চিকিৎসাসেবা নেওয়ার পরও ভালো না হওয়ায় পুনরায় অন্য কোনো শহরাঞ্চল বা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখে পূর্বের প্রতিবেদন সঠিক ছিল না। এ অভিযোগটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ঘটছে। এ প্রসঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত একজন চিকিৎসক (যিনি বেসরকারিতে প্র্যাকটিস করে থাকে) জানান, "উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মান ভালো না, যে ধরনের মানসম্পন্ন প্রতিবেদন আশা করি তা পাই না এবং যে কারণে উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরীক্ষাগুলো করানো হয় তা জেলা পর্যায়ে বা বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রহণ করা হয় না।"

৪.৬ ওষুধ

যে কোনো ধরনের অপারেশনের জন্য সেবাগ্রহীতাকে কখনো কখনো বাইরে থেকে ওষুধ কিনে দিতে হয়, আবার কখনো কখনো প্যাকেজ চুক্তি করা হয়, যার মধ্যে ওষুধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে সমস্যাটি হলো সেবাগ্রহীতার জন্য কী পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার করা হলো তার হিসাব সেবাগ্রহীতা বা তার অ্যাটেনডেন্টকে যেমন দেওয়া হয় না, আবার চুক্তির মধ্যে যেসব ওষুধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল, তার পুরোটা দেওয়া হয় না, বরং পরবর্তীতে আরও ওষুধ কিনে দিতে হয়। সেবাগ্রহীতার ওষুধ থেকে কিছু ওষুধ বাঁচানোর চেষ্টা এবং পরবর্তীতে অন্য রোগীর কাছে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ১১: অতিরিক্ত ওষুধ বাইরে বিক্রি

"অপারেশনের জন্য ৪ হাজার টাকার ওষুধ কিনে আনতে বলা হয় এবং এর মধ্য থেকে সকল ওষুধ ব্যবহার করা হয় না। বরং অব্যবহৃত ওষুধগুলো নার্স এবং আয়ারা পাশের ফার্মেসিতে বিক্রয় করে দেয় যা আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

- বিভাগীয় পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী

৪.৭ বিশেষায়িত সেবা

একজন সঙ্কটাপন্ন রোগীর শারীরিক কর্মকাণ্ড সক্রিয় রাখার জন্য বিশেষায়িত সেবা, যেমন ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ), করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ), নিও-ন্যাটাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (এনআইসিইউ), হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) প্রভৃতি ধরনের সেবার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও ওষুধ ব্যবহার এবং সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে রাখতে হয়। সেবাগ্রহীতা এক্ষেত্রে বাঁচতে পারেন, আবার মারাও যেতে পারেন। এই ধরনের সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শয্যা অনুসারে কী ধরনের জনবল রাখতে হবে এবং তাঁদের যোগ্যতা কি হবে সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা[৪৯] না থাকায় একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে সেবা প্রদান করছে। বিভাগীয় শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান, "আইসিইউ সেবা প্রদানের জন্য যে ধরনের প্রটোকল মানা উচিত, বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানেই তা মানা হয় না। যেমন, বিদেশে একজন আইসিইউ রোগীর প্রতি ৩ থেকে ৬ ঘন্টা পরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা পর্যালোচনা করা হয়, অথচ বাংলাদেশে দিনে মাত্র একবার পরীক্ষা করা হয়।"

কিছু ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা মারা যাওয়ার পরও আইসিইউতে রেখে দেওয়া অথবা আইসিইউ সেবার প্রয়োজন না হওয়া সত্ত্বেও আইসিইউতে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক আইসিইউ থেকে প্রতি মাসে সুনির্দিষ্ট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় বলে গবেষণায় জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বিভাগীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান, "যখন একটি আইসিইউ ইউনিট রাখা হয়, রোগী থাক বা না থাক এর ব্যবস্থাপনার জন্য বা এর আদর্শমান বজায় রাখতে বা প্রটোকল মেনে চলার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়, যে কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান এই খরচ তুলে আনার জন্যই অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, তাছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ রোগী ভর্তি হয় তার ১ থেকে ২ ভাগের ক্ষেত্রে আইসিইউ সেবার প্রয়োজন হয়, সেইজন্য হাসপাতালগুলো সাধারণ শয্যার পাশাপাশি এই ধরনের সেবার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানে শুধু বিশেষায়িত সেবার ব্যবস্থা রাখা হয় (যেমন, আইসিইউ সেবা)। আইসিইউ একটি হাসপাতালের অংশ হতে পারে, কিন্তু শুধু আইসিইউ সেবা

[৪৯] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এক নির্দেশনায় বলা হয়, "কোনো কোনো ক্লিনিক/হাসপাতাল নির্দিষ্ট সংখ্যক শয্যা বিশিষ্ট সাধারণ হাসপাতাল/ক্লিনিক এর লাইসেন্স গ্রহণ পূবর্ক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিনা অনুমতিতে স্পেশালাইজড সেবাসমূহের (আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ, রেনাল হেমোডায়ালাইসিস, মাদকাসক্তি নিরাময় ক্লিনিক, ডায়াবেটিকসহ অন্যান্য) কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এই সকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের অভাবে কখনও কখনও অনাকাঙ্খিত ঘটনারও উদ্ভব হচ্ছে। তাছাড়া সঠিক তথ্যের অভাবে এই সকল সেবা প্রদানের বিষয়ে যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রমেও বিঘ্ন ঘটছে; যার প্রেক্ষিতে যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে (বিজ্ঞপ্তি জারির দশ দিনের মধ্যে) সেবার ধরন, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট জনবলের তালিকা প্রেরণের কথা, অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে"। *তথ্যসূত্র:* স্মারক নং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/প্রাঃ ক্লিঃ/বিবিধ/১৫/১৩৩৫, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

থাকতে পারে না।" বিভাগীয় পর্যায়ের আরেকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক জানান মালিক যদি মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয় যে একটি আইসিইউ থেকে প্রতি মাসে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মুনাফা করতে হবে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকরা এই ধরনের দুর্নীতি করে থাকে, যা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক এবং মালিকের নৈতিকতার ওপর। অন্যদিকে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের বিশেষায়িত সেবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সংকটাপন্ন রোগীকে ভর্তি করাতে অপারগতা প্রকাশ করে। কারণ, রোগী মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন মারা যাওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারে না এবং এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করতে পারে ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে।

৪.৮ প্রসূতি সেবা

বিলম্বিত প্রসব প্রক্রিয়া, স্বাভাবিক প্রসব ব্যর্থ হওয়া, গর্ভকালীন রক্তক্ষরণ, সেফালোপেলভিক অসামঞ্জস্যতা, বাচ্চার অস্বাভাবিক অবস্থান, পানি ভাঙ্গা, যমজ সন্তান, মাতৃত্বকালীন উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যা, জরায়ুর টিউমার, শিশুর জন্মকালীন ওজন খুব কম হওয়া, ফিটাল ডিসট্রেস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সি-সেকশনের প্রয়োজন[৫০] থাকলেও গবেষণার সম্ভাব্য প্রসবের দিনের অনেক পূর্বে সি-সেকশন করানোর অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় যেমন সি-সেকশন করানো হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লাভের জন্যও সি-সেকশন করানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ১২: অপ্রয়োজনীয় সি-সেকশন

"আমার বন্ধুর বোন সন্তান-সম্ভবা এবং প্রতি মাসের চেকআপের জন্য চিকিৎসকের কাছে যায়। ডেলিভরির শেষের দিকে চিকিৎসকের কাছে গেলে চিকিৎসক তাকে ভর্তি হওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়, যদিও ডেলিভারির জন্য নির্ধারিত দিনটি অনেক দেরিতে ছিল এবং তার কোনো শারীরিক সমস্যা ছিল না। সে জানায়, সুনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেবাগ্রহীতারা চিকিৎসকের কাছে গেলে সরাসরি ভর্তি হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে যাতে অপারেশনটি হাতছাড়া হয়ে না যায়।"

"আমার স্ত্রীর ডেলিভারির ব্যথা হালকা ছিল, চিকিৎসককে দেখাতে গেলে উক্ত রাতেই সিজার করানোর জন্য পরামর্শ দেয়, যদিও সম্ভাব্য তারিখ অনেক পিছনে ছিল, কোনো অতিরিক্ত ব্যথা ছিল না। ডাক্তার আমার শ্বাশুড়িকে বলে, 'আপনার তো নাতী (ছেলে শিশু) হবে, দেরি করে লাভ কি, আপনারা রিস্ক কেনো নিবেন'?"

- জেলা পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সেবাগ্রহীতারা

"গ্রাম থেকে আসা একজন প্রসূতিকে নিয়ে স্বনামধন্য একজন চিকিৎসকের কাছে গেলে চিকিৎসক প্রসূতির শরীরে পানি কমে গেছে এবং ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই সিজার করতে হবে বলে প্রসূতিকে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেয়, যদিও প্রসবের জন্য সম্ভাব্য তারিখ আরও একমাস বাকি ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে প্রসূতিকে ভর্তি করানো হলো, যদিও আমাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা ছিল না। চিকিৎসক বললো 'আপাতত কিছু টাকা দেন, বাকি টাকা পরে দিলে হবে'। সিজারের সময় দেওয়া হলো রাত ৮টায়, কিন্তু সিজার করা হলো না। আবার সময় দেওয়া হলো রাত ১২টায়, তখনও সিজার করা হলো না। চিকিৎসক বললো, 'সেবাগ্রহীতার অবস্থা একটু ভালো, পরবর্তী দিন সকালে সিজার করা হবে'। তখন চিকিৎসকের সাথে এ বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা হলে তিনি বলেন, 'দেখুন এসব বিষয়ে আমরা কোনো রিস্ক নেই না, আমরা তো রোগীর ভালোর জন্যই সব কিছু করি'।"

- বিভাগীয় পর্যায়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন সেবাগ্রহীতা

বাংলাদেশে সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (২০১৪) অনুযায়ী দেশে সি-সেকশনের মাধ্যমে প্রসবের হার ক্রমাগত বাড়ছে - ২০০৪ সালে যেখানে ছিল মোট প্রসবের ৪ শতাংশ, ২০০৭ সালে এটি ৯ শতাংশ, ২০১১ সালে ১৭ শতাংশ, এবং ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ শতাংশে।[৫১] পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে এ হার ৫% (২০১১), ভারতে ১৮% (২০১০), এবং শ্রীলংকায় ৩০.৫% (২০১৪)।[৫২] উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী এ হার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হওয়া উচিত।[৫৩] বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার ৮০% এবং এনজিও পরিচালিত

---

[৫০] বিস্তারিত, http://www.stopuncs.org/Bn/Faq (২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

[৫১] বিস্তারিত, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR311/FR311.pdf (২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

[৫২] *প্রাগুক্ত*।

[৫৩] বিস্তারিত, http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/en/ (২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

প্রতিষ্ঠানে ২৮%, যেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ হার ৩৮%।[৫৪] একটি তথ্য অনুযায়ী দেশের ৭০ শতাংশ সিজারিয়ান ডেলিভারিই অপ্রয়োজনীয়।[৫৫]

উপজেলা পর্যায়ে একটি বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক চিকিৎসকের দায়িত্বপালনকারী একজন জানান মালিকপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে প্রসূতিকে সি-সেকশন করানোর জন্য মটিভেশন করতে বলে, যদিও সাধারণ প্রসব সম্ভব। তিনি আরও জানান, "কোনো মাসে সিজারের সংখ্যা কম হলে বেতন দেরিতে দেওয়া হয়।" এ প্রসঙ্গে সেবাগ্রহীতারা জানায়, গুরুতর কোনো সমস্যা না থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রসবের অনেক পূর্বে সি-সেকশন করানো হচ্ছে। তাদের মতে এটা চিকিৎসক ও ক্লিনিকের মালিকদের অর্থ উপার্জনের ফন্দি ছাড়া আর কিছু নয়।

উপজেলা পর্যায়ে একটি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণের সময় একজন সেবাগ্রহীতা প্রসব ব্যথা নিয়ে গেলে ঐ মুহূর্তে কোনো চিকিৎসক না থাকার কারণে ম্যানেজার নিজেই একজন নার্সকে সাথে নিয়ে পরীক্ষা করে এবং বলে সিজার করতে হবে। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করেও চিকিৎসক পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর একজন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান তাঁর আসতে দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগবে। তখন প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাটেনডেন্টকে বলা হয় "এখন আপনার ইচ্ছা, আপনি ইচ্ছা করলে রোগী নিয়েও যেতে পারেন, আবার অপেক্ষাও করতে পারেন, আবার অন্যত্র নিয়ে যেতেও অনেক সময় লাগবে"। এভাবে রোগীকে প্রভাবিত করা হয় এবং পরবর্তীতে রোগী উক্ত প্রতিষ্ঠানে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

৪.৯ সেবার মূল্য

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে প্রধানত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিবেচনায়। যে কারণে দেখা যায় একই সেবার মূল্য প্রতিষ্ঠানভেদে এবং এলাকাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার মূল্য ও অন্যান্য সার্ভিজ চার্জ সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আর্থ-সামজিক অবস্থা এবং অন্যান্য এলাকার নির্ধারিত মূল্য বিবেচনা সাপেক্ষে ঐ এলাকার মালিক সমিতি নির্ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে একটি জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কর্মকর্তা জানান, "বেসরকারি হাসপাতালগুলোর যে মূল্য তা সাধারণ মানুষের জন্যে নয়। এটি একটি ব্যবসা, একেক হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার খরচ ভিন্ন, সার্ভিস চার্জও ভিন্ন, কিন্তু দেখা উচিত সেবামূল্য মানুষের সাধ্যের মধ্যে আছে কি না।" উল্লেখ্য, সরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে এসব সেবার মূল্যের ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

সারণি ৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সেবার মূল্যের তারতম্য ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা

পরীক্ষার নাম	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য (টাকা)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য (টাকা)
লিপিড প্রোফাইল	৭০০ - ১,৬৫০	৩০০
প্লাটিলেট কাউন্ট	৭০ - ৫০০	৫০
সিরাম ক্রিয়েটিনিন	২১০ - ৫৮০	৫০
সিরাম ক্যালসিয়াম	২১০ - ৭০০	৮০
আলট্রাসনোগ্রাম (হোল এবডোমেন)	৫৫০ - ৮০০ (সাধারণ) ৮০০ - ২,২০০ (ডিজিটাল কালার)	২১০ (সাধারণ)

- **পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য:** পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এলাকাভেদে মূল্যের ক্ষেত্রে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি প্রতিষ্ঠানভেদেও এর ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, প্রতিষ্ঠানভেদে প্লাটিলেট কাউন্ট সর্বনিম্ন ৭০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, সিরাম ক্রিয়েটিনিন ২১০ টাকা থেকে ৫৮০ টাকা, সিরাম ক্যালসিয়াম ২১০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা, লিপিড প্রোফাইল ৭০০ টাকা থেকে ১,৬৫০ টাকা, সিরাম ইলেকট্রোলাইট ৪৫০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা, টি৩ টি৪ টিএসএইচ ৫০০ টাকা থেকে ১,৮৫০ টাকা, ইউরিন আর/এম/আই ৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা, স্টুল সিএস ৩০০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকা, স্কাল বিভি ৫০০ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা, আলট্রাসনোগ্রাম হোল এবডোমেন ৫৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা (নরমাল) এবং ৮০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা (কালার ডপলার) পর্যন্ত নেওয়া হয়।
- **চিকিৎসকের পরামর্শ ফি:** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত না থাকার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি'র ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভেদে সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা পর্যন্ত পরামর্শ ফি নেওয়া হয়।

---

[৫৪] বিস্তারিত, http://www.stopuncs.org/Bn/Faq (২৪ নভেম্বর ২০১৭)।

[৫৫] *প্রাগুক্ত।*

পুরাতন রোগীর পরামর্শ ফি'র ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন দেখানোর ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে ফি নেওয়া হয়।

- **সি সেকশন:** সি সেকশনের খরচের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক হয়ে থাকে এবং এই চুক্তিও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, চুক্তিভিত্তিক সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে শয্যাভেদে সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। টাকা কম-বেশি হয় সার্জন ফি, শয্যা ভাড়া, ওষুধের ধরন প্রভৃতির ওপর। চুক্তিভিত্তিক সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হয়, এর অতিরিক্ত দিন থাকার প্রয়োজন হলে পৃথকভাবে টাকা দিতে হয়।

৪.১০ তথ্যের উন্মুক্ততা

৪.১০.১ চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স

নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে জনসম্মুখে প্রদর্শন সম্পর্কে বলা হলেও[৫৬] গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স জনসম্মুখে দৃশ্যমান স্থানে টানানো নেই (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত **১১৬**টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৫টির)।

৪.১০.২ চিকিৎসকের পরামর্শ ফি

সংশ্লিষ্ট আইনে পরামর্শ ফি'র তথ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন[৫৭] সম্পর্কে বলা হলেও পরবর্তীতে এক সংশোধনীর[৫৮] মাধ্যমে তা শিথিল করা হয়। এছাড়া বিএমডিসি প্রণীত চিকিৎসকদের পেশাগত আচরণ ও নীতিতে পরামর্শ ফি সাধারণ জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] তবে গবেষণায় দেখা যায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেম্বার করা চিকিৎসকদের পরামর্শ ফি সংক্রান্ত তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে টানানো নেই। গবেষণায় নির্বাচিত ৫০টি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের মধ্যে ২৮টিতে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সম্পর্কিত তথ্য টানানো আছে, তবে আংশিকভাবে। কিছু প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ভিজিটের ক্ষেত্রে পরামর্শ ফি এবং সময়সীমা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকলেও প্রতিষ্ঠানের সকল চিকিৎসকের ক্ষেত্রে এটি দেওয়া নেই।

৪.১০.৩ পরামর্শ ফি এবং বিভিন্ন সেবা মূল্যের রশিদ প্রদান

আইন অনুযায়ী চিকিৎসক কর্তৃক সেবাগ্রহীতাকে পরামর্শ ফি'র রশিদ ছাপা ফরমে এবং বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরির আদায়কৃত বিভিন্ন সেবা মূল্যের রশিদ সেবাগ্রহীতাকে ছাপা ফরমে দিতে হবে।[৬০] গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত বিভিন্ন সেবা মূল্যের রশিদ সেবাগ্রহীতাকে ছাপা ফরমে দেওয়া হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পরামর্শ ফি'র রশিদ সেবাগ্রহীতাকে দেয় না।

৪.১০.৪ চিকিৎসকদের ডিউটি রোস্টার

চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক কর্তব্যরত চিকিৎসক সম্পর্কিত তথ্য যেমন প্রদর্শন করা হয় না, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তব্যরত কনসালটেন্ট (অন-কল ভিত্তিক ও স্থায়ী) সম্পর্কিত তথ্যও টানানো হয় না। আইনে এ সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শন ফরমে চিকিৎসক, নার্স, ও সুইপারের ডিউটি রোস্টার সংরক্ষণ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক চিকিৎসকদের ডিউটি রোস্টার সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা জানায় কে কখন দায়িত্ব পালন করবে তা চিকিৎসকরা নিজেরা নিজেরাই রোস্টার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪.১০.৫ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা থাকলেও সকল সেবার মূল্য টানানো নেই। আবার কিছু ক্ষেত্রে শুধু শয্যা ভাড়া সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে। গবেষণায় নির্বাচিত ৫০টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের মধ্যে ২১টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা নেই।

৪.১০.৬ চিকিৎসা বর্জ্য

সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় প্রতিটি বর্জ্য রাখার পাত্রে স্পষ্ট বাংলা ভাষায় রং ভেদে বর্জ্যের ধরন এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।[৬১] তবে গবেষণায় দেখা যায়, কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী বর্জ্য পাত্র ব্যবহার

---

[৫৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, Licence for Private Hospital/Clinic/Diagnostic Centre।

[৫৭] *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২*, ধারা ৭।

[৫৮] *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) (সংশোধন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪*, ধারা ৪।

[৫৯] বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, Code of Professional Conduct, Etiquette and Ethics, 3.4।

[৬০] *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২*, ধারা ৬ (২)।

[৬১] *চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ২ এর তফসিল-৩।

সম্পর্কে তথ্য টানানো থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা মানা হয় নি। গবেষণায় ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯০টি প্রতিষ্ঠানে রংভেদে কোন পাত্রে কি ধরনের বর্জ্য ফেলতে হবে এ ধরনের নির্দেশিকা প্রদর্শন করা নেই।

৪.১০.৭ সেবাগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধকরণ

সংশ্লিষ্ট আইনে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে প্র্যাকটিস করা চিকিৎসক এবং বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরিদের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ রাখার জন্য রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বলা হয়েছে।[৬২] তবে গবেষণায় দেখা যায়, বেসরকারি ক্লিনিকগুলো সেবাগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করলেও মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ও ল্যাবরেটরিগুলো শুধু সেবাগ্রহীতার নাম লিপিবদ্ধ করে, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে না।

৪.১০.৮ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংরক্ষণ

গবেষণায় দেখা যায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) কাছে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয় না। ম্যানুয়ালি আংশিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের কারণে সব ধরনের তথ্য তাৎক্ষণিক সরবরাহ করতে পারে না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য, যেমন জনবল, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, নিবন্ধন ও নবায়ন, পরিদর্শন, অভিযোগ, শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকাশের ব্যবস্থা নেই।

চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নে তথ্যভাণ্ডার তৈরির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মে মাসে দেশের সকল বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোকে প্রতিবেদন প্রদানকারী কনসালটেন্টের (প্যাথলজি, বায়োকেমেস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি ও রেডিওলজি ইমেজিং) নাম, পদবি, বর্তমান কর্মস্থল (সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে কোড নাম্বার), সম্মতিপত্র, সনদপত্র, বিএমডিসি'র নিবন্ধন নাম্বার, এবং মোবাইল নম্বরসহ নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রদান করার জন্য বলা হয়, অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।[৬৩] পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর হালনাগাদ তালিকা (প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, এদের মধ্যে কতটি লাইসেন্স প্রাপ্ত, কতটি লাইসেন্স প্রাপ্ত নয়, লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে থাকলে হালনাগাদ নবায়ন আছে কি না, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় জনবল, অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি আছে কি না) সম্পর্কিত তথ্য সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (নির্দেশ-পরবর্তী ১০ দিন) প্রদানের জন্য ২০১৬ সালের জুলাই মাসে নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৬৪] তবে এসব তথ্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে লিপিবদ্ধ করা হয় নি এবং এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানা যায়।

৪.১০.৯ চিকিৎসক সম্পর্কে তথ্যের অভিগম্যতা

দেশে নিবন্ধিত/ অনিবন্ধিত চিকিৎসক বা ভুয়া পদবি ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে বিস্তারিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। বিএমডিসি'র রেজিস্টারে অভিযোগকারীর নাম এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হলেও অভিযোগের ধরন এবং এর হালনাগাদ তথ্য রাখার ব্যবস্থা নেই। বিএমডিসি'র ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশেরও ব্যবস্থা নেই।

৪.১১ উপসংহার

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিয়ে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ বিভিন্ন মাত্রার। তাদের অভিযোগের মধ্যে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক সেবা না পাওয়া, ফলো-আপ সেবা না পাওয়া, নার্স ও অন্যান্য সেবাদাতাদের সেবাদানে ঘাটতি, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভুল প্রতিবেদন, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় সি-সেকশন, অপ্রয়োজনীয় বিশেষায়িত সেবা, চিকিৎসাসেবায় সুনির্দিষ্ট মূল্য না থাকার কারণে সেবার মূল্যের ব্যাপক তারতম্য, সেবার মূল্য প্রদর্শনে ঘাটতি, চিকিৎসকদের ভুয়া ও অতিরিক্ত ডিগ্রি ব্যবহার, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আরও দেখা যায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংরক্ষণেও সংশ্লিষ্ট তদারকি প্রতিষ্ঠানে ঘাটতি বিদ্যমান।

[৬২] *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স*, ১৯৮২, ধারা ৬ (১)।

[৬৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্মারক নং-স্বাঃ অঃ/হাসঃ/প্রাঃক্লিঃ/বিবিধ/১৫/৭৭২, ২৬ মে ২০১৫।

[৬৪] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্মারক নং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/বিবিধ/২০১৬/১১৬০(৭২), ১৩ জুলাই ২০১৬।

অধ্যায় পাঁচ

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম

৫.১ ভূমিকা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হচ্ছে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের সেবার মান নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরমাণু শক্তি কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান আইন মেনে চলছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মাঝে মাঝে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। চিকিৎসকদের পেশাগত চর্চা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল। তবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থাকার পরেও বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে অভিযোগ উদ্ধাপিত হয়। এ অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে।

৫.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম

বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর মান নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তদারকি কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয় বলে গবেষণায় দেখা যায়। নিবন্ধন ও নবায়নের সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হলেও উক্ত সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়ে আকস্মিক পরিদর্শন করা হয় না। এ প্রসঙ্গে একটি জেলার সিভিল সার্জন জানান, "শুধু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য কোথাও যাওয়া হয় না, যখন কোনো কাজে একটি উপজেলায় যাওয়া হয় তখন সেই উপজেলার বেসরকারি ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে আসা হয়।"

যেহেতু প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন ও নবায়নের সময়ই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদর্শনের সুযোগ হয়, সেহেতু যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর নবায়নের কাজ সম্পন্ন করে না সেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর পরিদর্শনের আওতার বাইরে থেকে যায় এবং তাদের সেবা কার্যক্রম যাচাইকরণের সুযোগ হয় না। আবার প্রতিষ্ঠানগুলো নবায়নের জন্য আবেদন করলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করা হয় না। ফলে এক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ফলো-আপ পরিদর্শন করা হয় না। একবার পরিদর্শনে পাওয়া অনিয়মের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরবর্তীতে সেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য ফলো-আপ করা হয় না, যদিও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ও সিভিল সার্জনদের মাধ্যমে ভিজিলেন্স টিম গঠন ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার কথা বলেছে।[৬৫] এ প্রসঙ্গে একজন সিভিল সার্জন জানান, তাঁর পক্ষে একা শতভাগ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৫.২.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকিতে প্রাপ্ত অনিয়মের ধরন

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শনে যেসব অনিয়ম দেখা যায় তার মধ্যে রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট জনবল না থাকা, নার্সদের দক্ষতায় ঘাটতি, কর্মরত ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্র না থাকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা না থাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৃথক রঙের বিন ব্যবহার না করা, মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট ব্যবহার ও ওষুধ বিক্রি, প্যাথলজি ফ্রিজে খাবার রাখা, চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টদের তালিকা না থাকা, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি (যেমন প্রতি ফ্লোরে ইজিসি ও নেবুলাইজার) না থাকা, আইসিইউ'র শয্যাগুলোকে পৃথক করার জন্য পৃথক দরজা ব্যবহার না করা, ডায়ালাইসিস করতে আসা রোগীর কাগজপত্র সংরক্ষণ না করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫.২.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বা শাস্তি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনে কোনো নিয়মের ব্যত্যয় খুঁজে পেলে কিছু ক্ষেত্রে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য মৌখিকভাবে সতর্ক করে। তবে কতগুলো প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি, যদিও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিভাগীয় পরিচালক

---

[৬৫] জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন (সভাপতি), মেডিকেল অফিসার-সিভিল সার্জন (সদস্য), কনসালট্যান্ট-সার্জারি/প্যাথলজি/রেডিওলজি (প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী যে কোন একজন) (সদস্য), এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য (সভাপতি), সিভিল সার্জন (সদস্য সচিব), সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য (সদস্য), মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজিস্ট/সার্জারি/রেডিওলজি বিভাগের কনসালটেন্ট বা সহকারী অধ্যাপক মর্যাদার যে কোনো একজন প্রতিনিধি (সদস্য)। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্মারক নং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/প্রাঃ ক্লিঃ ল্যাবঃ/বিবিধ/১৬/২০৮৪(২)/১(২), ৮ নভেম্বর ২০১৬।

(স্বাস্থ্য) ও সিভিল সার্জনদের প্রতিমাসে পরিদর্শন প্রতিবেদন (ব্যবস্থা গ্রহণের বর্ণনাসহ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে।[৬৬] প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়মের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কতগুলো প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করেছে তার সঠিক পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় নি। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কর্মকর্তা জানান এর সংখ্যা খুবই কম যা বছরে একটি বা দুইটি। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়েছে।

৫.৩ ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি

জেলা পর্যায়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্ব-উদ্যোগে, সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে, গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদেশের প্রেক্ষিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে। সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে যাচাই করা হয় এবং অভিযান চালানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিভাগীয় পর্যায়ের একটি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে গোয়েন্দা তৎপরতার ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়ার পরই মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্ট বেসরকারি চিকিৎসাসেবার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, যেমন ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯, মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০, মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ অধ্যাদেশ ১৯৮২, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

৫.৩.১ ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক অভিযানে প্রাপ্ত অনিয়মের ধরন

ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক পরিচালিত অভিযানে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে যেসব অনিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত নোংরা অপারেশন থিয়েটার, মেয়াদোত্তীর্ণ রি-এজেন্ট ব্যবহার, নির্দিষ্ট মাত্রায় রি-এজেন্ট না রাখা, পূর্ব থেকেই রিপোর্টে চিকিৎসকের স্বাক্ষর থাকা, ব্লাড ব্যাংকের নবায়ন না থাকা, চিকিৎসক না থাকা, নার্স, ওটি বয় এবং ওয়ার্ডবয় কর্তৃক সিজার অপারেশন, পরীক্ষা ছাড়া প্রতিবেদন তৈরি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, চিকিৎসক ও নার্স অ্যাপ্রোন পরিধান না করা, মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, হাসপাতালের লাইসেন্স প্রদর্শন না করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা, মেডিকেল বর্জ্য প্রতিদিন অপসারণ না হওয়া ইত্যাদি। এসব অনিয়ম প্রসঙ্গে ঢাকার একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, "এসব অনিয়মের অধিকাংশই ঢাকা মহানগরীর সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে হয়ে থাকে। এখানেই যদি এতো সমস্যা পাওয়া যায় তবে কম পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে কী অবস্থা তা ভাবার অবকাশ রয়েছে।"

৫.৩.২ ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি

ভ্রাম্যমাণ আদালত মাঝে মাঝে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও নিয়মের ব্যত্যয়ে শাস্তি দিলেও তা খুবই সীমিত। ও মোবাইল কোর্ট বা জরিমানা করেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা করেছে বলে দেখা যায়।

৫.৪ চিকিৎসকদের তদারকি

সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিকিৎসকদের তদারকি কার্যক্রমে দুর্বলতা রয়েছে দেখা যায়। আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত কোনো চিকিৎসক এমন কোনো নাম, পদবি, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করতে পারবেন না যার ফলে তাঁর কোনো অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে বলে কেউ মনে করতে পারে বলা হলেও[৬৭] গবেষণায় দেখা যায় বেশিরভাগ চিকিৎসক তাঁদের নামের পাশে অতিরিক্ত যোগ্যতা ব্যবহার করছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ডিএলও (ডিইউ), বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (শেষ পার্ট), সিএমইউ (আল্ট্রাসনোগ্রাফ), ডিডিভি (বিএসএমএসইউ), পিজিটি (মেডিসিন), ডিএমইউডি-গাইনি, সিসিডি, এফসিপিএস (মেডিসিন পার্ট-২), এমআরসিএস (লন্ডন) ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে বিএমডিসি'র একজন কর্মকর্তা জানান, "বাংলাদেশের চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ৬০ হাজার চিকিৎসকের মধ্যে ৫০ হাজার চিকিৎসকই অতিরিক্ত ডিগ্রি ব্যবহার করছে।" চিকিৎসকদের অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা ব্যবহার না করার জন্য বিএমডিসি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।[৬৮] কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুয়া পদবির ব্যবহারের মাধ্যমেও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভুয়া চিকিৎসকদের শাস্তি প্রদান করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

৫.৪.১ সরকারি চিকিৎসকদের অফিস সময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান

আইনে সরকারি চিকিৎসকদের সরকারি চাকরির সময়ে বাইরে বেসরকারি প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ করা হলেও সরকারি দায়িত্বকালীন সময়ে কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসক কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবা প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একজন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জানান, "সদর হাসপাতালের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক আছে যারা অফিস সময়ে

---

[৬৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্মারক নং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/প্রাঃ কিঃ ল্যাবঃ/বিধি/১৬/২০৮৪(২)/(২), ৮ নভেম্বর ২০১৬।

[৬৭] *বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০* এর ধারা ২৯ অনুযায়ী।

[৬৮] বিস্তারিত, http://bmdc.org.bd/news/warning-instruction/ (১৭ এপ্রিল ২০১৪)।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন-কলে সেবা প্রদান করে এবং অনেক চিকিৎসক আছে যারা সকাল সাড়ে আটটায় 'বায়ো থাম্ব' (বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স) দিয়ে চলে যায়, এগারটার দিকে হাসপাতালে আসে।" উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত একজন চিকিৎসক জানান, "বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সেবাগ্রহীতার সিরিয়াস অবস্থায় যদি আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠান থেকে কল আসে, সিভিল সার্জন স্যারকে অবহিত করে অফিস সময়ে আমরা এসব প্রতিষ্ঠানে যাই এবং এক্ষেত্রে আমরা একজন মানুষের জীবন নিয়ে চিন্তা করি।"

৫.৪.২ সেবা প্রদান না করলেও চিকিৎসকদের নাম ব্যবহার

কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে চেম্বার না করলেও তাঁদের নাম উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসক জানেন, আবার কিছু ক্ষেত্রে জানেন না। কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেসব চিকিৎসক আগে প্র্যাকটিস করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্র্যাকটিস করছেন না, সেক্ষেত্রে তাঁদের নামের ওপর 'ক্রস' দেওয়া রয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালের একজন মেডিকেল কর্মকর্তা ঐ এলাকায় একটি বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে পূর্বে চেম্বার করলেও গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সময়ে করছিলেন না, কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে তাঁর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, সাংবাদিক, ফলে এদের বিরোধিতা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে জেলা পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানের একজন মালিক জানান, "একজন চিকিৎসকের সাথে আমার চুক্তি হওয়ার পর তিনি কাজ শুরু করলেও কিছুদিন পর দেখা যায় চুক্তি অনুযায়ী কাজ করছে না, তখন উক্ত চিকিৎসককে না করে দেওয়া হয়। কিন্তু না করে দেওয়ার সাথে সাথেই তাঁর নামটি সরিয়ে ফেলা হয় না, যতক্ষণ না নতুন চিকিৎসক আসে।"

৫.৪.৩ চিকিৎসক সম্পর্কিত প্রচারণা

আইন অনুযায়ী স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, বিলবোর্ড এবং অন্যান্য মাধ্যমে চিকিৎসকেরা তাঁদের পেশাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন, তবে ছবি প্রকাশ করতে পারবেন না। তবে দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে একজন চিকিৎসক তাঁর ছবি দিয়ে প্রচারণা করেছেন।[৬৯]

৫.৪.৪ চিকিৎসকদের নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার

চিকিৎসকদের ভিজিটিং কার্ড ও প্রেসক্রিপশনে নামের পাশাপাশি নিবন্ধন নম্বর ব্যবহারের কথা[৭০] বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানা হয় না।

৫.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা হতে বলা যায়, চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা রয়েছে। প্রতিবছর বিন্ধন নবায়ন না করার কারণে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতার বাইরে থেকে যায়। প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনের শর্ত মেনে চলায় ঘাটতি রয়েছে। চিকিৎসকদের কোড অব প্রফেশনাল কনডাক্ট চর্চার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে, যেমন অতিরিক্ত ও ভুয়া পদবি ব্যবহার, বিজ্ঞাপনে ছবি ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত না থেকেও নাম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

[৬৯] *দৈনিক মুক্ত বাঙ্গালি*, ৩ আগস্ট ২০১৬।

[৭০] বিএমডিসি'র ২০১৭ সালের ২১ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী। সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ মার্চ ২০১৭।

অধ্যায় ছয়

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব

৬.১ ভূমিকা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুশাসন পরিমাপে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মরত বিশেষজ্ঞগণ ১০টি সুশাসনের উপাদান চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে কৌশলগত দূরদর্শিতা (strategic vision), অংশগ্রহণ ও ঐকমত্য (consensus orientation), আইনের শাসন (rule of law), স্বচ্ছতা (transparency), সংবেদনশীলতা (responsiveness), ন্যায্যতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ (equity and inclusiveness), কার্যকরতা ও দক্ষতা (effectiveness and efficiency), জবাবদিহিতা (accountability), তথ্য ও জ্ঞান (intelligence and information), এবং নৈতিকতা (ethics)।[৭১] তবে এই গবেষণায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য উপাদানগুলোর ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব উপদানা হচ্ছে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও নৈতিকতা। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে সুশাসনের বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫: সুশাসনের বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে গবেষণার পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ

সুশাসনের উপাদান	গবেষণার পর্যবেক্ষণ
আইনের শাসন	• বিদ্যমান আইনি কাঠামো যুগোপযোগী নয়; বিদ্যমান আইন প্রয়োগে ঘাটতি বিদ্যমান • নিবন্ধন ও নবায়ন প্রক্রিয়ার শর্তাবলী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেনে চলা হয় না • নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থাপনা দুর্বল
স্বচ্ছতা	• নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি বিদ্যমান • প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত চিকিৎসাসেবার তথ্য প্রকাশে ঘাটতি বিদ্যমান
জবাবদিহিতা	• সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএমডিসি, মালিক সংগঠন) পক্ষ থেকে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে ঘাটতি বিদ্যমান • সেবাগ্রহীতাদের জন্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা দুর্বল • নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান • নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্তৃপক্ষের কাছে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য প্রদানের কাঠামো নেই
সক্ষমতা	• বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান (জনবল, অবকাঠামো, ওষুধ ও যন্ত্রপাতি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ) • নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা (জনবল, অবকাঠামো) দুর্বল • নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে সমন্বয়ের ঘাটতি
নৈতিকতা	• নিবন্ধন ও নবায়নে অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতি • প্রচারণা, বিপণন ব্যবস্থায় কমিশনভিত্তিক ব্যবস্থা • সেবা প্রদানে (চিকিৎসকের সেবা, রি-এজেন্ট, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সেবার মূল্য ইত্যাদি) আর্থিক দুর্নীতি

৬.২ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের ঘাটতির কারণ

৬.২.১ আইনি সীমাবদ্ধতা

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় আইন থাকলেও তা হালনাগাদ না করার ফলে এ অধ্যাদেশে উল্লিখিত সেবার মূল্য ও শাস্তি বাস্তব প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য নয়। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রধান আইনের নিবন্ধন, অবকাঠামো, জনবল, সেবার মূল্য, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ, অভিযোগ ও শাস্তি সংক্রান্ত বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়।

---

[৭১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৪, Health Systems Governance for Universal Health Coverage: Action Plan, Department of Health Systems Governance and Financing, http://www.who.int/universal_health_coverage/plan_action-hsgov_uhc.pdf?ua=1 (৭ নভেম্বর ২০১৭)।

৬.২.২ আইন/ নীতির প্রয়োগে ঘাটতি

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রযোজ্য আইন ও নীতির প্রয়োগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সীমিত বলে লক্ষ করা যায়। এর ফলে চিকিৎসাসেবায় ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতে কর্মরত চিকিৎসকদের ন্যূনতম মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণে শৈথিল্য, বিভিন্ন সেবার অতিরিক্ত মূল্য ও মূল্যের তারতম্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তির সামান্য প্রয়োগ ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

৬.২.৩ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতার ঘাটতি

তদারকির জন্য জনবলের ঘাটতি: বাংলাদেশে যে পরিমাণ বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে সেগুলো তদারকির ও পরিদর্শনের জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা। এই শাখার ছয়জন কর্মকর্তাকে (দুইজন উপ-পরিচালক, দুইজন সহকারী পরিচালক ও দুইজন মেডিকেল কর্মকর্তা) ঢাকা মহানগরীসহ অন্যান্য এলাকার প্রতিষ্ঠান তদারকি করতে হয়। তাছাড়া এই শাখা সরকারি চিকিৎসাসেবার আওতায় থাকা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে শুরু করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলোর তদারকিও করে থাকে। ফলে এই ছয়জনের পক্ষে কয়েক হাজার বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান সরেজমিনে পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না।

পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবলের অপর্যাপ্ততার কারণে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ ও বর্জ্য সম্পর্কিত তদারকি কার্যক্রম খুবই দুর্বল। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যমতে বর্তমানে ২১টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিস রয়েছে। বাংলাদেশের সকল জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম না থাকায় জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ের পরিদর্শকদের (ইন্সপেক্টর) একাধিক জেলায় পরিদর্শন কাজ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি বিভাগীয় শহরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক জানায়, তার পরিদর্শককে উক্ত বিভাগের ৮টি জেলায় পরিদর্শনের কাজ করতে হয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০-এ চিকিৎসকদের ভুয়া পদবি ব্যবহার এবং নিবন্ধনহীন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও এসব বিষয়ে পরিদর্শন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয় নি। অন্যদিকে সারা বাংলাদেশে চিকিৎসকদের এসব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে বিএমডিসিতে পর্যাপ্ত জনশক্তি নেই।

মালিক সমিতির সক্ষমতার ঘাটতি: বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকির ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় প্রতিষ্ঠানের মালিক সমিতির (বিপিসিডিওএ) সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। মালিক সমিতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু নিবন্ধন বা নবায়ন করার জন্য অনুরোধ করতে পারে, কিন্তু তাদের বাধ্য করার কোনো এখতিয়ার নেই। বিপিসিডিওএ'র সংঘবিধিতে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনের বিধি-বিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে যেমন বলা হয় নি, একইভাবে মালিক সমিতির জবাবদিহিতা সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি। তবে মালিক সমিতির এক বিজ্ঞপ্তিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি বিধি-বিধান মেনে চলা এবং এসোসিয়েশনের সদসস্যপদ গ্রহণের জন্য আহবান জানানো হয়।[৭২]

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে বলা হয়েছে, সকল বেসরকারি ক্লিনিক, হাসপাতাল, রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রসমূহকে বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশনের (বিপিসিডিওএ) সদস্যপদ আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সদস্যপদ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়িক সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।[৭৩] কিন্তু সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, মাত্র একহাজারের কিছু বেশি প্রতিষ্ঠান এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

৬.২.৪ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ঘাটতি

বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং জেলার সিভিল সার্জনকেও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় রেখে পৃথকভাবে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিবিড়ভাবে তদারকি করা সম্ভব হয় না। পরিদর্শন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যায় প্রতিবছর ৩০ থেকে ৪০ ভাগ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র পরিদর্শন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একটি জেলার সিভিল সার্জন জানান, "নিয়মিত পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না, কারণ ছোট জেলাগুলোতে ডেপুটি সিভিল সার্জন পদটি নেই, আবার সিভিল সার্জন অফিসে তিনজন মেডিক্যাল কর্মকর্তার পদায়ন থাকলেও আছে মাত্র একজন, এতে তদারকির কাজটা শতভাগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।" অধিকন্তু, বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস থেকে জানা যায়, সিভিল সার্জনের ব্যস্ততার কারণে তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত ভিজিল্যান্স টিমের পরিদর্শনে তাঁকে সবসময় পাওয়া যায় না, এবং

[৭২] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫।

[৭৩] বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্মারক নং-এমসি/অবা-৬/এ-৯/৯৪/২৮/১(৬), ১৯ জানুয়ারি ২০০৪।

বিভাগীয় অফিসে সহকারী পরিচালকের মোট তিনটি পদের (রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন, নার্সিং) পদায়ন থাকলেও সহকারী পরিচালক রয়েছেন একজন। বাকি দুটি পদ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী তৈরি না হওয়ায় উক্ত এলাকায় অবস্থিত সকল বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র পরিদর্শন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ইতোমধ্যে নিবন্ধিত না হয়েও চিকিৎসক পরিচয়ে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা না করা এবং প্যাড ও ভিজিটিং কার্ডে অতিরিক্ত ডিগ্রি ব্যবহার না করা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিএমডিসি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেও সারা বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে এসব কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিএমডিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, "প্রেসক্রিপশন প্যাড এবং ভিজিটিং কার্ডে অতিরিক্ত ডিগ্রি ব্যবহার না করার জন্য ঢাকায় বড় বড় অনেক হাসপাতাল ও ক্লিনিককে চিঠি দিয়ে অবহিত করা হলেও মাত্র ২০ ভাগ সাড়া প্রদান করে।"

এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরকে চার শ্রেণির মোট ১৮৬ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান তদারকি করতে হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক জানান, "পরিবেশ অধিদপ্তরকে শুধু বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য নয়, ইটের ভাটাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করতে হয়, ফলে হাসপাতালের বর্জ্য নিয়ে খুব বেশি তদারকি কার্যক্রম করা হয়ে ওঠে না।"

চিকিৎসা বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী একটি কমিটি গঠন (যেখানে বিভাগীয় অফিস, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি রয়েছে) করা হলেও এই কমিটি সক্রিয় নয়। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক একজন মহা-পরিচালক জানান, তাঁর সময় পর্যন্ত একটি বা দুটি সভা হয়েছে, এর প্রচারণা কম এবং এটি ঠিকভাবে মানাও হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ও সিভিল সার্জনদের জেলা প্রশাসন ও র‍্যাবের সহযোগিতায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার কথা বলা হলেও[৭৪] তা খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট জানান, "প্রশাসনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দিক থেকে উদ্যোগ খুবই কম।" একজন সিভিল সার্জন জানান, "তদারকির ক্ষেত্রে ডিসি অফিসে আবেদন করতে হয়, তাদের যখন সময় হয় তখন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।"

বক্স ১৩: দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব

জেলা পর্যায়ের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার সমর্থিত শ্রমিক নেতা, তার প্রতিষ্ঠানটি বিগত ছয় বছর ধরে নবায়ন করায় নি। এক্ষেত্রে সিভিল সার্জন অফিস কোনো পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাবোধ করে। আবার উক্ত জেলায় আরেকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক যিনি মালিক সমিতির সভাপতি (ক্ষমতাসীন দলের জেলা পর্যায়ের নেতা) তিনি লাইসেন্স নবায়নের সময় যেসকল তথ্য এবং নথিপত্র জমা দিতে হয়, সেখানে একটি কাগজ কম থাকায় তাকে ফোন করা হলে, তিনি রাগ করে বলেন, "বোঝেন তো, দল কিন্তু ক্ষমতায় আছে।"

- একজন সিভিল সার্জন

"এই শহরে যারা রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র খুলছে তাদের কিছু বললে তারা দলের প্রভাব দেখায়। তারা স্বল্প মূল্যে রোগীদের টেস্ট করে দেয় এবং এদের পরীক্ষার মান ভালো না। তারা বিভিন্ন চিকিৎসকদের তাদের প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর জন্য রোগী পাঠানোর জন্য বাধ্য করে। তারা যদি রোগী না পাঠায় তাহলে তারা চিকিৎসকদের হুমকি দেয়, রাস্তায় আটকে ঝামেলা করে। এতে চিকিৎসকরা বাধ্য হয়ে তাদের কাছে রোগী পাঠায়।"

- একজন সিভিল সার্জন

৬.২.৫ স্বচ্ছতার ঘাটতি

নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি বিদ্যমান। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসকদের ওপর বিস্তারিত তথ্য, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত চিকিৎসাসেবার তথ্য প্রকাশেও ঘাটতি বিদ্যমান। এর ফলে সেবাগ্রহীতারা সঠিক ও যথাযথ সেবা কম মূল্যে পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

৬.২.৬ জবাবদিহিতায় ঘাটতি

সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএমডিসি, মালিক সংগঠন) পক্ষ থেকে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে ঘাটতি বিদ্যমান। নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্তৃপক্ষের কাছে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য প্রদানের কাঠামো নেই, ফলে এদের সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তথ্য চাইলেও সব প্রতিষ্ঠান সাড়া দেয় না। উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনিবন্ধিত এবং নবায়ন

[৭৪] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্মারক নং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/প্রাঃ কিঃ ল্যাবঃ/বিধি/১৬/২০৮৪(২)/(২), ৮ নভেম্বর ২০১৬।

করা হয় নি এমন অনেক প্রতিষ্ঠান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো জবাবদিহিতার আওতার বাইরে রয়েছে।

সেবাগ্রহীতাদের জন্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থাও দুর্বল। ফলে সেবা প্রদানে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে এর প্রতিকারের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা কার্যত অপারগ।

৬.২.৭ স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব

নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তি এবং বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি উভয়ই চিকিৎসক হওয়ার কারণে এই কার্যক্রমে তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। এর ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানকে আইনের ব্যত্যয় ঘটার প্রেক্ষিতে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। এছাড়া তদারকিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বা চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি কার্যক্রম জোরালো নয়। এ প্রসঙ্গে একজন সিভিল সার্জন বলেন, "যেহেতু চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে চিকিৎসকদের প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়, সেহেতু তদারকি কার্যক্রমে দুর্বলতা রয়েছে।"

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে দলীয় রাজনৈতিক কর্মীর সম্পৃক্ততা এবং পরিদর্শন কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার ঘটে থাকে। যেকোনো রাজনৈতিক নেতার ক্লিনিক বা হাসপাতালে পরিদর্শনে গেলে তারা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে, তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। যে কারণে সিভিল সার্জনেরা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেন।

৬.৩ বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ

- **অতি মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার:** বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত মুনাফাভিত্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেহেতু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশিরভাগই আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য এই ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে।
- **প্রতারণানির্ভর চিকিৎসাসেবার প্রসার:** গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় এ খাতে বিপণন ও সেবা প্রদান কমিশনভিত্তিক হওয়ার কারণে প্রতারণার একটি প্রবণতা বিদ্যমান।
- **সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি বৃদ্ধি:** ভুল ও অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা, চিকিৎসায় অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যু, অঙ্গহানি ও দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এসব কারণে মানসম্পন্ন চিকিৎসা না হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ভোগা, দালাল কর্তৃক প্রতারিত হওয়া, অতিরিক্ত পরীক্ষা প্রদান, ভুল প্রতিবেদনের কারণে পুনরায় পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে সেবাগ্রহীতারা আর্থিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- **চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থার সৃষ্টি:** চিকিৎসকের অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেওয়া, সেবাগ্রহীতাকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠানো এবং কমিশন গ্রহণ, ভুল প্রতিবেদন, ভুয়া চিকিৎসক কর্তৃক সেবা প্রদান এবং রোগীর মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনায় চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হচ্ছে।
- **বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি:** চিকিৎসাসেবার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হওয়ায় যাদের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে তারা উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এর সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে, এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।
- **রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি:** চিকিৎসা-বর্জ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অপসারণ যথাযথভাবে না হলে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণি ৬: একনজরে বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের ঘাটতি-ফলাফল-প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ আইনি সীমাবদ্ধতা (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আইন ও বিধির অনুপস্থিতি ও হালনাগাদ আইন না থাকা) ▪ আইন/নীতির প্রয়োগে ঘাটতি ▪ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতার (অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতি) ঘাটতি ▪ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ঘাটতি	▪ নিবন্ধন ও নবায়নে অনিয়ম ▪ কমিশনভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা ▪ সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত না হওয়া ▪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাত সঠিকভাবে না হওয়া ▪ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকা	▪ চিকিৎসাসেবার নামে অতি মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার ▪ প্রতারণানির্ভর চিকিৎসাসেবার প্রসার ▪ সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি ▪ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
■ স্বচ্ছতার ঘাটতি ■ জবাবদিহিতায় ঘাটতি ■ স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব	■ নিয়মিত তদারকি না হওয়া ■ সেবার অতিরিক্ত মূল্য	■ বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি ■ রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি

৬.৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসনের ঘাটতির পেছনে আইনি সীমাবদ্ধতা, আইন/নীতির প্রয়োগে ঘাটতি, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতার (অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতি) ঘাটতি, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ঘাটতি, স্বচ্ছতার ঘাটতি, জবাবদিহিতায় ঘাটতি, এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ খাতে সুশাসনের ঘাটতির ফলে নিবন্ধন ও নবায়নে অনিয়ম, কমিশনভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা, সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত না হওয়া, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাত সঠিকভাবে না হওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকা, নিয়মিত তদারকি না হওয়া এবং সেবার অতিরিক্ত মূল্য লক্ষ করা যায়। এ খাতে সুশাসনের ঘাটতির প্রভাবে চিকিৎসাসেবার নামে অতি মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার, প্রতারণানির্ভর চিকিৎসাসেবার প্রসার, সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি, চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি, বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি, এবং রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধ্যায় সাত

উপসংহার

৭.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

উপরোক্ত অধ্যায়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এ খাতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতি বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দুর্বল তদারকি ব্যবস্থায় এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। অপরিকল্পিতভাবে এই খাতের সম্প্রসারণের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হওয়ায় চিকিৎসাসেবার গুণগতমান নিশ্চিত হচ্ছে না এবং দুর্নীতি ও অনিয়ম ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা দিলেও তা জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বেসরকারি চিকিৎসাসেবার বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা প্রকট; অর্থাৎ অতি মুনাফা কেন্দ্রিক সেবা কার্যক্রম, কমিশনভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা, গুণগত মানের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগত বিস্তৃতি ঘটছে। গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের যথাযথ মনোযোগের ঘাটতি রয়েছে; যেমন, বিভিন্ন পরিকল্পনায় গুরুত্ব না দেওয়া, আইন হালনাগাদ না করা, নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন না করা, পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতি, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ইত্যাদি। এছাড়া আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়া, স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি কারণে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইনের খসড়া নিয়ে কাজ করা হলেও তা এখনো আইন হিসেবে প্রণয়ন হয় নি। উপরোল্লিখিত কারণে, একদিকে এটি যেমন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে, এবং অন্যদিকে কিছু ব্যক্তির এ খাত থেকে বিধি-বহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই ব্যবস্থার কাছে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা জিম্মি হচ্ছে; একদিকে ব্যাপকভাবে আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে এবং অন্যদিকে মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে না। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক সেবা না পাওয়া, সহকারী নার্স ও আয়া কর্তৃক চিকিৎসাসেবা প্রদান, পরীক্ষা না করে প্রতিবেদন তৈরি, যথাযথ বর্জ্য অপসারন না হওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকা ইত্যাদি ঘাটতিগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষনীয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হচ্ছে।

৭.২ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফল থেকে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা খাতের সুশাসন বাড়ানোর জন্য নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে।

আইন ও নীতি সম্পর্কিত

১. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে একটি স্বাধীন কমিশন তৈরি করতে হবে

২. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করে আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:
   - নার্সিং হোম, ক্লিনিক, জেনারেল হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন ও শয্যা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিকরণ করতে হবে। এই শ্রেণি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে, যেমন অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি;
   - প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি অনুযায়ী নিবন্ধন ও নবায়ন ফি নির্ধারণ;
   - প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল ছাড়পত্রের বাধ্যবাধকতা;
   - প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি/ উৎপাদন খরচ/ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাভেদে বিভিন্ন সেবার মূল্য নির্ধারণ;
   - প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের বাধ্যবাধকতা;
   - শাস্তির পরিমাণ সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মতভাবে বৃদ্ধি।

৩. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে (তথ্য প্রাপ্তি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য

৪. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে (কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে)।

৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন নির্ধারণ করে দিতে হবে।
৬. অন-লাইনের মাধ্যমে লাইসেন্স আবেদন ও নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
৭. চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও তাদের সেবা সম্পর্কিত সকল ধরনের হালনাগাদ তথ্য (চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর, নবায়নকাল, সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানকারী জনবল ও তাদের নিবন্ধন নম্বর, অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এসব তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।
৮. চিকিৎসা-বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে সক্রিয় এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়নকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।
৯. বিএমডিসির ওয়েবসাইটে সব চিকিৎসকের নিবন্ধন নম্বর এবং শিক্ষার ধরন অনুযায়ী অনুসন্ধানের বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি চিকিৎসকের নাম দিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং চিকিৎসক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে।
১০. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারীদের অভিযোগ দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএমডিসি) পরিচালনায় আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
১১. চিকিৎসকদের অনৈতিক প্রচারণা ও কার্যক্রম চিহ্নিত ও রোধ করার জন্য সারা দেশে বিএমডিসি'র তদারকির আওতা বাড়াতে হবে।
১২. অনিবন্ধিত সকল চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে, এবং এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৩. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

সেবা সম্পর্কিত

১৪. সকল প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব সেবা প্রদানে পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক এবং ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ব্যবস্থা, ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার, নারী সেবাপ্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে
১৫. কর্মরত সকল সেবা প্রদানকারীর জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধানের ব্যবস্থা বা আইডি কার্ড ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
১৬. সেবা প্রদানকারীদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে (যেমন, নার্সদের ইউনিফর্মে/ আইডি কার্ডে, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ও ভিজিটিং কার্ডে)।